বাঙালীর খাদ্য

পাটনা প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ মেডিক্যাল কলেজের ও কলিকাতা পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের
শারীর-বিদ্যার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, পরিপুষ্টি ও কৃষি-সম্বন্ধীয় গবেষণার ভূতপূর্ব্ব
সংযোজক অফিসার, পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের পরিপুষ্টি-সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা-
কমিটির সদস্য ও কলিকাতা আর্. জি. কর মেডিক্যাল
কলেজের শারীর-বিদ্যার অধ্যাপক

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ডি. এস্-সি. (এডিন), এম্. এস্-সি., এম্. বি. (ক্যাল),
এম্. আর্. সি. পি., এফ্. আর্. এস্. ই.

প্রণীত

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা—১২

১৯৪৯

মূল্য ২।• আড়াই টাকা মাত্র

বাঙালীর খাদ্য-সমস্যা-সমাধানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা
বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র
রায় মহাশয়ের করকমলে লেখকের
অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ
অর্পিত হইল।

ভূমিকা

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক মন্ত্রী-বন্ধুর গৃহে আর একজন মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আলোচনা-প্রসঙ্গে যখন দেশের সর্ব্বত্র আন্দোলন, ধর্ম্মঘট, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির কথা উঠ্‌লো, তখন আমি বললাম "শারীর-তত্ত্বের একটা প্রধান কথা আপনাদের কাছে ব'লব, তা হচ্ছে এই যে, পেট ভরে খেতে পেলে শরীরের অন্যান্য অংশের শোণিত-প্রবাহের অধিকাংশ পেটের দিকে যেতে বাধ্য হয় এবং তারই ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং হাত-পা প্রভৃতির কাজও সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। সুতরাং আপনারা যদি দেশকে এ অবাঞ্ছিত অবস্থা হতে মুক্ত করতে চান তবে অবিলম্বে পেট ভরে ভাত এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করুন; তাহলেই দেশের সব উৎপাত দূর হবে।" এ কথাগুলির যাথার্থ্য পরীক্ষা করে দেখতে আমি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী-প্রমুখ মন্ত্রি-মণ্ডলীকে অনুরোধ করি এবং সেজন্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের হাতে তুলে দিচ্ছি।

বাঙালীর খাদ্য-সমস্যা একটি চিরন্তন সমস্যা। এ কঠিন সমস্যা-সমাধানের জন্য বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানী ও পুষ্টিবিদ্‌গণ নানা উপায়ে চেষ্টা কচ্ছেন। একই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সময়ে আমার যে সকল প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, অনেক বন্ধু-বান্ধব ও জিজ্ঞাসুর আগ্রহাতিশয্যে সেগুলিকে একত্র করে এবং তার সঙ্গে আধুনিক খাদ্য-সঙ্কট হতে পরিত্রাণলাভের জন্য কি করা উচিত, সে সমস্তই আলোচনা করে 'বাঙালীর খাদ্য' লিখিত এবং প্রকাশিত হ'ল। প্রায় একযুগ ধরে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধগুলি লেখা হলেও তাদের বিষয়-বস্তু কিংবা উপকারিতা একটুও বদলায়নি বা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোন কোন স্থলে একই বিষয়ের হয়ত পুনরুল্লেখ হয়ে থাকবে, কিন্তু বিষয়গুলির

গুরুত্ব এত অধিক যে পুনঃ পুনঃ উক্তির দ্বারাও যদি লোকের মন অবশ্য কর্ত্তব্য-বিষয়গুলির দিকে সম্যক্ আকৃষ্ট হয়, তাহলেও কতকটা ফল পাওয়া যাবে, এই যা' ভরসা। মেজর জেনারেল (তদানীন্তন কর্ণেল) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত এ. সি. চ্যাটার্জ্জি মহাশয় ১৯৩৯ সালে বাংলার স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টররূপে বাংলা দেশের অনেকাংশে পুষ্টি-সংক্রান্ত কার্য্যাবলী স্বচ'ক্ষে দেখবার এবং বুঝবার জন্য আমাকে যে সুযোগ দিয়েছিলেন, সেজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। তৎকালে বাংলার নিউট্রিশন অফিসার সতীর্থ বন্ধুবর ৺ শৈলেন চাটার্জ্জি আমার সহচর-রূপে আমাকে তাদের কার্য্যকলাপের কেন্দ্রগুলি দেখাবার জন্য যেরূপ সৌজন্য ও আতিথেয়তা দেখিয়েছিলেন, তা' চিরদিন আমার মনে থাকবে। বন্ধুবর অকালে পরলোকগমন করেছেন, সুতরাং তাঁর স্মৃতির প্রতিও কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা প্রকাশ ক'রছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙীন হালদার, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বসু, বার-এট্-ল প্রভৃতি পাটনার অকৃত্রিম বন্ধুগণ আমাকে সর্ব্বদাই পুষ্টি-সম্বন্ধীয় গবেষণা ও প্রচার-কার্য্যের জন্য প্ররোচিত ও উৎসাহিত করেছেন, তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ ক'রছি। পরিশেষে খাদ্যের রন্ধন-সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি লিখতে আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সাহায্য না পেলে তা' সুষ্ঠুভাবে লেখা কখনই সম্ভবপর হ'ত না; এজন্য তাঁকেও 'I. O. U' জানাচ্ছি।

এ পুস্তিকা-প্রকাশে প্রকাশক চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ বহু যত্ন ও পরিশ্রম করেছেন, সেজন্য তাঁরাও ধন্যবাদার্হ।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

সূচীপত্র

বাঙালীর খাদ্য

উপক্রমণিকা *

ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অনেকগুলি দেশাত্মবোধক কবিতা মুখস্থ করেছিলুম; সেগুলির অধিকাংশই 'ধনধান্য-পুষ্পে ভরা' সোনার বাংলার প্রশস্তি। এখনো সময়ে সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে তাদের দু'-একটি লাইন স্মৃতিপটে আনাগোনা করে। একটি কবিতায় 'সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা ও শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমির রূপ সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে,—

"আছে কত নদী-পুকুর, জলে আছে মাছ;
বাংলাদেশের বনে আছে মিষ্টফলের গাছ।
আছে কত ধানের জমি, ফুলের বাগান কত;
আর কোন দেশ নয়কো যাদু, বাংলাদেশের মত।
বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙালী নাম ধরি;
আমাদের মা সোনার বাংলা, তাঁকেই প্রণাম করি।"

জীবনের মধুর প্রভাতে সোনার বাংলার এই যে আদর্শ অপরূপ মাতৃমূর্ত্তি কল্পনার নেত্রে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল, যতই দিন যেতে লাগলো, এটা যে নেহাৎ নিছক কল্পনা এবং

---

* স্বাস্থ্য—আশ্বিন, ১৩৪৬।

বাস্তবের সঙ্গে এই নয়ন-মুগ্ধকর চিত্রের কোনও মিল নেই, তাই প্রকট হ'য়ে উঠতে লাগলো। সুজলা, সুফলা এবং শস্যশ্যামলার পরিবর্ত্তে রিক্তা, হৃতসর্ব্বস্বা বাংলা মায়ের যে দৈন্য ক্রমশঃ চোখের সামনে ভেসে উঠলো, তাতে মনে হোল যে, 'সোনার বাংলা' কথাটাই একটি নিষ্ঠুর পরিহাস এবং "সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী" এই কবিতাটি ভাবপ্রবণ বাঙালী কবির সোনার বাংলার ভাঙ্গা-হাটে অনশনে কিংবা অর্দ্ধাশনে সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর চির-বুভুক্ষু সর্ব্বহারাদের জন্য কোমলসুরে গাওয়া এক ঘুম-পাড়ানো গান ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশে আজও নদী-পুকুরের কোন অভাব নেই সত্যি, কিন্তু সাতকোটি বাঙালীর পুষ্টিবিধানের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাছ তাদের জলে আছে বললে অন্যায় বলা হবে। হয়ত কোনও এক কালে ছিল, কিন্তু এখন লোকসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বভাবতঃ আরাম-প্রিয় ও পরিশ্রম-বিমুখ বঙ্গসন্তান নিজেদের খাদ্যের অত্যাবশ্যক অংশ (মাছে-ভাতে বাঙালী !) মাছের চাষের দিকে উপযুক্তভাবে কোন নজর দেওয়া আবশ্যক ব'লে কখনো মনে করে নি ; অধিকন্তু যে সময়ে মাছের পেটে ডিম জন্মায়, সে সময়েও অকুণ্ঠিতভাবে মাছের বংশ নষ্ট ক'রতে দ্বিধাবোধ করে না এবং তার ফল কি তা' ভাবেও না। সুতরাং সেই অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্যের ফলে আজ বাংলাদেশের পুকুরে মাছের একান্ত অভাব। নদীগুলিও কতকটা

নৈসর্গিক কারণে এবং কতকটা কৃত্রিম উপায়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পপরিসরা, শীর্ণকায়া ও ক্ষীণস্রোতা হয়ে পড়েছে। সুতরাং আগে সেগুলিতে যে পরিমাণে মাছ পাওয়া যেতো, এখন তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

তারপরেই কবি ব'লেছেন "বাংলাদেশের বনে আছে মিষ্টফলের গাছ!" জানি না এরকম খাদ্য-সম্ভারপূর্ণ বন বাংলাদেশের কোথায় আছে এবং যদি বা মানুষের নাগালের বাইরে সুন্দরবনে, কিংবা দার্জ্জিলিংএর শৈলশিখরে কোথাও এরকম মিষ্টফলের গাছ গহন অরণ্যের শোভা বাড়ায়, তাহ'লে হয়ত ফলগুলি আপনিই সেখানে ঝরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, বাঙালীর পুষ্টিবিধানে তার দ্বারা বিশেষ কোন সাহায্যই হয় না। বাংলাদেশে নিজস্ব এবং স্থানীয় ফলের চাষ খুবই কম হয়; কলা, কাঁঠাল, পেঁপে, নারিকেল, আম, আনারস এবং কোথাও কোথাও কমলালেবু ছাড়া বাংলা-দেশে আর অন্য কোন ফলের চাষ নেই বললেও চলে। খাদ্যের এই অতি-প্রয়োজনীয় অংশভুক্ত ফসলের দিকেও বাঙালীর একেবারেই নজর নেই। যতদিন বিহার হ'তে আম ও লিচু, সিঙ্গাপুর হ'তে কলা ও আনারস, দার্জ্জিলিং, খাসিয়া পাহাড় ও নাগপুর হ'তে কমলালেবু, কোয়েটা, পেশোয়ার, কাশ্মীর অথবা কুলুভ্যালি হ'তে আপেল, নাশপাতি প্রভৃতি এবং বেলুচিস্থান, পেশোয়ার, কিংবা কাবুল হ'তে আখরোট, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি শুকনো ফল এবং আঙুর প্রভৃতি টাটকা ফল কলিকাতার বাজারে ঝুড়ি-ভর্‌তি হয়ে

আসবে, ততদিন ঘুমন্ত বাঙালীর পক্ষে বাংলার মাটিতে ফলের চাষের আবশ্যকতা আছে ব'লেই খেয়াল হবে না। কিন্তু এত দূর-দূরান্ত হ'তে যে-যৎসামান্য ফল আসে, তার শত-করা নব্বই ভাগই আসে রাজধানী কলিকাতায়; মফঃস্বলের শহরে কিংবা পল্লী-অঞ্চলে সেগুলিকে কেউ বড় একটা চোখেও দেখতে পায় না এবং চোখে দেখলেও তা' কিনে খাওয়ার মত সামর্থ্য খুব কমলোকেরই আছে। বাংলায় নিজস্ব যে অতি সামান্য মরসুমী ফলের ফসল হয়, আর অন্যান্য প্রদেশ হ'তে যা' আসে, তা'ও বাংলার লোকসংখ্যার তুলনায় অতি অপ্রচুর, কারণ এ প্রদেশের মাত্র এক-দশমাংশের প্রয়োজন তাতে মিট্‌তে পারে, তার বেশী নয়।

'আছে কত ধানের জমি'; খুবই সত্যি কথা যে বাংলাদেশে ধানের জমির অভাব নেই এবং ভগবানের অসীম দয়া যে অতি অল্পায়াসেই তাতে সোনা ফলে! 'না চাহিতে জল-ধারা' বাংলার চাষীর প্রাণে শান্তি-সঞ্চার করে এবং তার পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব করে। যুগযুগান্তর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী সোনার বাংলা অন্নপূর্ণারূপে বাঙালীর মুখে অন্নদান ক'রে আসছে এবং বাঙালী দ্বিধাহীন চিত্তে মায়ের সেই দান গ্রহণ ক'রে চলেছে। উপযুক্ত পরিমাণে দুধ পেতে হ'লে যেমন গরুকে উপযুক্ত আহার্য্য দিতে হয়, তেমনি বাংলার মাটিতে চিরকাল সোনা ফলাতে হলে চাই তার জন্য উপযুক্ত সারের ব্যবস্থা। বাঙলার চাষীর সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র নেই, অথচ তারা চায় প্রতিবৎসর

ষোল আনা ফসল ! তার উপরে সময়ে সময়ে দৈবদুর্ব্বিপাকে অনাবৃষ্টি এবং কখনও বা অতিবৃষ্টির ফলও ভোগ কর্ত্তে হয়, তবু এগুলির প্রতিষেধের জন্য তাদের কিছুমাত্র আগ্রহ, চেষ্টা কিংবা যত্ন নেই। ভগবান্ নষ্ট ক'ল্লে কি ক'রে তা' রোধ করা যাবে, এই চিরন্তন উক্তি তাদের পুরুষকারহীনতার চরম নিদর্শন। অন্যান্য প্রদেশে যেখানে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়, সে সকল স্থানেও কি করে চাষবাস চলে, তা তারা জানে না কিংবা জানতে চায়ও না এবং অনাবৃষ্টির সময়ে অনুরূপ উপায় অবলম্বন ক'রে দৈবদুর্ব্বিপাকের হাত থেকে বাঁচবার মত দূরদৃষ্টি, সাহস এবং সহিষ্ণুতা তাদের নেই। যে জমি অতিবৃষ্টির সময়ে বন্যার জলে ভেসে যায় এবং ফলে তার সকল ফসল নষ্ট হ'য়ে যায়, কিছু পরিশ্রমের দ্বারা পূর্ব্বাহ্লেই তার জল-নিকাশের ব্যবস্থা ক'রে রাখলে যে নিষ্ঠুর অদৃষ্টের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, এ কথাও তারা ভাবতে অক্ষম। তা' ছাড়া সমস্ত বাংলাদেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে লক্ষ লক্ষ একর জমি বৎসরের মধ্যে বারো মাসই জলের নীচে চাষের অযোগ্যভাবে পড়ে থাকে; সমবেত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে যে সেগুলিকে উদ্ধার ক'রে ফলপ্রসূ করা যায়, উত্তরবঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বেই তা' প্রমাণিত হ'য়েছে। জলাভূমি হ'তে খাল কেটে নদীতে জল-নিকাশের ব্যবস্থার ফলে সম্প্রতি রংপুরে এ রকম হাজার হাজার একর জলাভূমি চাষ-আবাদের উপযুক্ত জমিতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বিস্তীর্ণ

জলাভূমির অবস্থানের জন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ যে গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার লীলানিকেতন ছিল; আশা করা যায় যে যুগ-যুগান্তের বদ্ধ জলের বহির্নিকাশের ফলে সে অঞ্চল হ'তে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি আবার স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হবে। এই ত গেল স্থানীয় উন্নতি; অনেক দূরবর্ত্তী স্থানগুলিও নানাভাবে উপকৃত হবে। যে মরা নদীতে এই বদ্ধ জল-নিকাশের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, সে নদী যে সকল অঞ্চলের উপব দিয়ে প্রবাহিত হয়, অনাবৃষ্টির সময়ে চাষেব উপযুক্ত জলের অভাব মোচন হতে পারবে ঐ ক্ষয়িষ্ণু নদীর বুকে জলাভূমি হ'তে বন্ধনমুক্ত জলের স্রোতে। বাংলাদেশে প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার নিজস্ব আবাসভূমি বলে পরিচিত। এককালে ঐ গ্রামগুলি ধনে-জনে এবং পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে বাংলার গৌরবস্থল ছিল, কিন্তু ভাগীরথীর শাখা-নদীগুলি কালক্রমে শুষ্ক ও শীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে এবং রেলওয়ে প্রভৃতির দ্বারা জলাভূমি হ'তে উপযুক্ত পরিমাণে জলের বহির্নিকাশের পথ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হওয়াতে সেই স্বাস্থ্যপূর্ণ গ্রামগুলিই এখন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। যাঁদের সচ্ছল অবস্থা, তাঁরা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন; আর যাঁদের সঙ্গতি নেই তাঁরাই নিতান্ত বাধ্য হ'য়ে গ্রামের মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন, বিত্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন অর্দ্ধমৃত অবস্থায়। এ সমস্ত গ্রামগুলিকে আবার স্বাস্থ্যকর সজীব ও চাষ-আবাদের যোগ্য ক'রতে হ'লে দু'টি

উপায়ে তা করা সম্ভবপর। প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ভাগীরথীতে বাঁধ (ড্যাম) দেওয়া, যাব ফলে এই ক্ষয়িষ্ণু শাখা ও উপনদীগুলি আবার পূর্ব্বের সচ্ছল অবস্থায় ফিরে যাবে; যে ভাবে মিশরদেশে নীল নদীতে বাঁধ (ড্যাম) দেওয়ার জন্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলি আবার স্বাস্থ্যকর, জনবহুল ও চাষের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ রংপুরের দৃষ্টান্ত-অনুযায়ী স্থানীয় অধিবাসীদের সমবেত চেষ্টার ফলে বদ্ধ জলাভূমিগুলি হ'তে এ সকল শীর্ণ ও শুষ্ক নদীগুলিতে জল নিকাশের পথ ক'রে একই সঙ্গে চাষ-আবাদের জন্য ভূমিগুলির উদ্ধার এবং দুর্দ্দান্ত মশককুলের বংশবৃদ্ধির পথ বন্ধ ক'রে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিকে আবার স্বাস্থ্যকব অঞ্চলে পরিণত করা। এর ফলে এই পুনর্জ্জীবিত নদীগুলি যে শুধু বাংলাদেশের অনেকাংশে অনাবৃষ্টির সময়ে চাষের উপযুক্ত জলের অভাব মোচন ক'রতে পারবে তা' নয়। 'আছে কত নদী-পুকুর, জলে আছে মাছ' কবিতার এ লাইনটিকে সম্পূর্ণভাবে না হ'লেও অন্ততঃ আংশিকভাবেও সার্থক ক'রে তুলতে পারবে। আর জলাভূমির উন্নতিসাধন ক'রে ধানের জমি বৃদ্ধি পাওয়াতে একই সঙ্গে বাঙালীর খাদ্যের অত্যাবশ্যক অংশ মাছ ও ভাত দু'য়েরই অধিক পরিমাণে সংস্থান হ'তে পারবে।

মাছের চাষের জন্য বাংলা দেশের মজা দীঘি, পুকুর ও ডোবাগুলিরও যথোচিত সংস্কার আবশ্যক এবং সেগুলিতে যা'তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিবৎসর মাছের চাষ হয়, সেজন্য

বাঙালীর যত্নবান্ হওয়া উচিত। এভাবে মাছের প্রাচুর্য্যের জন্য যে শুধু বাঙালীর পবিপুষ্টির সহায়তাই হবে এমন নয়, পল্লীগ্রামে মশা ও সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়ার উপদ্রবও কমে যাবে, কারণ সংস্কৃত পুকুর ও ডোবাগুলিতে সহজে মশা জন্মাতে পারে না, এবং যদি বা কিছু মশা ডিম পাড়ে, বর্দ্ধিত মাছের সংখ্যা সেগুলিকে অঙ্কুরেই নষ্ট ক'রে ফেলবে, যেহেতু মশার ডিমগুলি মাছের অতি প্রিয় এবং উপাদেয় খাদ্য। অধিকন্তু পুকুর-কাটানো মাটিতে কলা, আনারস প্রভৃতি ফলের বাগান এবং ছোলা, অড়হর প্রভৃতি দালের ফসলও ভাল হয়, সুতরাং 'বাংলা দেশের বন'এর দিকে তাকিয়ে মিষ্ট ফলগাছের বাগানের কল্পনা ক'রে মনকে প্রবোধ দিতে হবে না; খাদ্যের অত্যাবশ্যক আর একটি উপাদান ফলমূলের অভাব তাতে কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চয়ই দূর হ'তে পারে।

সোনার বাংলার প্রশস্তির কবি খাদ্যের আরো দু'টি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কথা একেবারেই উল্লেখ করেন নি, কারণ সোনার বাংলায় দুধ ও মধু নদীর জলের মত প্রবাহিত হ'চ্ছে বললে কবি-কল্পনাকে শুধু আকাশ-কুসুমের সঙ্গেই তুলনা করা যেতো। যদিও আর একজন কবি বলেছেন "পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী, গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে ··তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।" কিন্তু ফুলের মধু যে ফোয়ারার মত মানুষের মুখেও এসে পড়ে, এমন কথা ব'লবার মত

দুঃসাহস কোন বাঙালী কবিই দেখাতে পারেন নি কখনও। বাঙলা দেশে গরুর হয়ত অভাব নেই কিন্তু দুধের খুবই অভাব। বাঙালী মুখে গো-মাতার উপাসক হ'লেও প্রকৃত-পক্ষে তাকে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যই করে, জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে। ফলে শীর্ণা, রুগ্না গোমাতাও সন্তানের প্রতি বিরূপ। বাংলা দেশের অনেক স্থানই বৎসরে চার-পাঁচ মাস জলের নীচে থাকে, ফলে শুকনো খড় ও কচুরিপানা প্রভৃতি আগাছা ছাড়া গরুর ভাগ্যে আর কোন খাদ্যই জুটে না। তার উপর কতকটা চাষীর নিজের অবহেলা এবং কতকটা প্রাকৃতিক কারণেও গোচারণের মাঠের সর্ব্বত্রই অভাব ; সুতরাং উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে যে দেশে দুধেরও অভাব হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তার উপর অপরিণত-বয়স্ক অজ্ঞাতকুলশীল, রুগ্ন এবং দুর্ব্বল ষাঁড় ও গরুর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বাংলার গো-বংশেরও যে বংশপরম্পরায় নিত্যই বাংলা দেশের অধিবাসীদের মতই অবনতি হচ্ছে, ইহা নিয়তির অপ্রতিষেধ্য অবশ্যম্ভাবী ফল, সুতরাং এ সম্বন্ধে মানুষের করণীয় কিছুই নেই মনে ক'রে নিয়তিতে অতি-বিশ্বাসী বাঙালী উদাসীন ও নিশ্চেষ্টভাবে বসে আছে। ফলে বাঙালী শিশু, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদাত্রী জননীদের খাদ্যে দুধের অভাবে ক্যাল্‌সিয়ামের অভাব-বশতঃ সোনার বাংলার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা "সোনার চাঁদেরা" দুর্ব্বল, অপরিপুষ্ট, উৎসাহহীন, ভাবপ্রবণ এক ক্ষয়িষ্ণু জাতির প্রতীকরূপে সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ ক'রছে। শুধু তাই নয়, চাষীরাও সুস্থ

ও সবল গরুর নিকট হ'তে যতটুকু চাষের সাহায্য পেতে পারতো, অক্ষম অকর্ম্মণ্য ও রুগ্ন গো-সন্তানের নিকট হ'তে তার অর্দ্ধেকও কাজ পায় না ; ফলে ফসলেরও ঘাট্‌তি পড়ে। এ ভাবে একটি অক্ষমতা অপরটিকে, আবার সেটিও ক্রমান্বয়ে অন্যটিকে ক্রমশঃই বাড়িয়ে তুলছে। কার্য্য এবং কারণের এরকম পাপাবর্ত্তন কোনও এক সময়ে আরম্ভ হয়ে চলেছে ত চলেইছে—তার আর বিরাম নেই। সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই চক্র না ভাঙতে পারলে এই দুরবস্থা কখনও দূর হবে না।

ভাত, মাছ, ফল এবং দুধের মত শাকসব্‌জিও যে খাদ্য-তালিকার একটা অপরিহার্য্য অংশ, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এ কথাটা জানা ছিল না ব'লেই বোধ হয় কবি তার উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা দেশের সঙ্গতিপন্ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এদিকে যতটা নজর দেওয়া উচিত, সেটুকু তাঁরা দেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন, লালশাক, পালংশাক, কলমিশাক, ওগুলি আবার কি খাদ্য! ওগুলি ত ছোটলোকেরা কিংবা চতুষ্পদ প্রাণীরা খায়! সত্যিই তাই ; বাংলা দেশের হাজার হাজার দরিদ্র লোকেরা, যারা এক বেলা খেয়ে প্রাণধারণ করে, তারা পরিশ্রমের দ্বারা চাষ না ক'রে, এই শাকগুলি যে সকল স্থানে আগাছার মত প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, সে সকল স্থান হ'তে সংগ্রহ ক'রে এক রকম

নিখরচায়ই তা' খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করে ; এটা মন্দের ভাল বলতে হবে, কারণ কোন মূল্যবান্ জৈব স্নেহ (ঘি-মাখন প্রভৃতি) না খেলেও এভাবেই তারা যথেষ্ট পরিমাণে ভাই-টামিন 'এ'-পূর্ব্ব উপাদান কেরোটিন ও রক্তগঠনের জন্য লোহা খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং তারই ফলে অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেও কোন রকমে বেঁচে থাকে। অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে লাল, মোটা চালের ভাত তাদের খেতে হয়, এটাও এক রকম 'শাপে বর'ই বলতে হবে, কারণ অধুনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, এ রকম চালে প্রোটীন, ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস্ এবং ভাইটামিন 'বি,' অনেক অধিক পরিমাণে থাকে। অধিকন্তু বাংলা দেশের দরিদ্র-জনসাধারণ যে সর্ব্বদা সিদ্ধ চালের ভাত খায় তাও এক হিসাবে আতপ চাল অপেক্ষা অনেক বেশী পুষ্টিকর, কারণ ধান সিদ্ধ হওয়ার সময়ে জলীয় বাষ্পের চাপে প্রোটীন, ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস্ ও ভাইটামিন 'বি,' চালের অভ্যন্তরভাগে চলে যায় ব'লে ছাঁটাইএর সময়ে তুষের সঙ্গে সেগুলি বাদ পড়ে না। আবার সিদ্ধ চালের ভাত পরিপাক হ'তে একটু বেশী সময় লাগে ব'লে যারা বহুক্ষণ আর কোন খাদ্য না খেয়ে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, তাদের পক্ষে এ চালই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

দরিদ্রের খাদ্যতালিকায় প্রোটীনের অভাব কতকাংশে পূর্ণ করে দাল। তাই ব'লে বেশী দাল একসঙ্গে খাওয়া উচিত নয়, চালের অনুপাতে দাল হবে এক-চতুর্থাংশ।

পল্লীগ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতেই ঘরের কোণে যে দু'এক ফালি জমি পড়ে থাকে, তাতে লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, ধুন্দুল, উচ্ছে, নটেশাক প্রভৃতি তরিতরকারি, এবং দু'একটি লেবুর গাছ, বিলাতি বেগুন কিংবা কাঁচালঙ্কার গাছ পুঁতলেও তাদের প্রয়োজনমত ভাইটামিন 'সি' ও কতকটা কেরোটিন তারা অনায়াসে পেতে পারে, তাতে আর্থিক সাশ্রয়ও খানিকটা হবে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশে ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ভাইটামিন 'ডি'র জন্য খরচ ক'রতে হয় মোটা রকমের কিছু, কিন্তু ভগবানের অসীম দয়া যে এদেশের সকলে (একমাত্র গুরুতরভাবে পর্দ্দানসীন মেয়েরা ছাড়া) ঐ রিকেট-প্রতিষেধক উপাদানটি বিনাখরচেই প্রভাতের অরুণালোক হ'তে লাভ করে। আর একটি উপাদান প্রজনন-সম্বন্ধীয় ভাইটামিন 'ই' বাংলা দেশের দরিদ্রেরা শাকসব্‌জি, কড়াই-মটরশুঁটি প্রভৃতি এবং অধুনা ঘরে ঘরে প্রচলিত চা হ'তে প্রচুর পরিমাণে পায় (যদিও আজকাল সেইগুলির জন্য ব্যয়ও বড় কম নয়), সুতরাং বাংলা দেশে অন্য সব কিছুর অভাব হলেও যেখানে অর্থের বা খাদ্যের যত অভাব, সেখানে 'মা ষষ্ঠীর কৃপা'ও সে পরিমাণে অধিক। সুতরাং বাংলার লোক-সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে এবং সে বর্দ্ধিত সংখ্যার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা ক'রতে না পারলে যারা জন্মাবে তারা বাঁচতে পারবে না। আবার যারা মরতে মরতে বাঁচবে তারাও জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকবে মাত্র। ভারতবর্ষের মধ্যে

বাঙালীর দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগ অন্যান্য সকল প্রদেশের আদর্শস্থল, কিন্তু অক্ষম এবং দুর্ব্বল বাঙালীকে একমাত্র মনোবল এবং হৃদয়ের সাহসই বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহও সুস্থ এবং সবল থাকে। তাই বাঙালীদের নিজের অক্লান্ত চেষ্টাতেই কাল্পনিক 'সোনার বাংলা'কে খাঁটি 'সোনার বাংলা'তেই পরিণত ক'রতে হবে। এমনই পুনর্জ্জীবিত 'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা' সোনার বাংলার গৌরবের ধন সাতকোটি সুস্থ ও সবলদেহ সুসন্তানের কণ্ঠ যেদিন একসুরে বলতে পারবে—

"বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোনার বাংলা, তাঁকেই প্রণাম করি।"

সেদিনই আমাদের 'মা'-ডাক এবং বেঁচে থাকা সার্থক হবে। তাই কবির সুরে ভগবানের চরণে আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রার্থনা হউক,—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান্।"

এ উদ্দেশ্যে মাথার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা ক'রে, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকার আরম্ভ। লেখক নিজে পূর্ণমাত্রায় আশাবাদী; সুতরাং সমস্যা যতই কঠিন হোক না কেন পরিণামে তার সাফল্যমণ্ডিত সমাধান হবেই হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালীর সাধারণ খাদ্য *

কিছুকাল পূর্ব্বে বাংলার জনস্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর, লেঃ কর্ণেল এ. সি. চাটার্জ্জি মহাশয়ের সৌজন্যে এবং বাংলার নিউট্রিশন অফিসার বন্ধুবর ডাক্তার শৈলেন চাটার্জ্জির সাহচর্য্যে বাঙালীর খাদ্য ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে অনেকটা নূতন অথচ মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বহুকাল কর্ণেল ম্যাক্‌কের বাংলার জেলের কয়েদীদের খাদ্য-বিশ্লেষণ, কর্ণেল ম্যাক্‌ক্যারিসনের ভারতীয় নানা প্রাদেশিক খাদ্য সম্বন্ধে ইঁদুরের পরিপুষ্টি-হিসাবে গবেষণা এবং অধুনা সুদূর কুনূরের পরিপুষ্টি গবেষণাগারের ডিরেক্‌টর এক্রয়েডের ভারতীয় নানাস্থানের খাদ্য-সম্বন্ধে কাল্পনিক মতবাদই বাঙালীর খাদ্য-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি ছিল। অবশ্য ৺রায়বাহাদুর চূণীলাল বসু মহাশয়ের বাংলাদেশের অনেকগুলি খাদ্য বিশ্লেষণ-তথ্য এবং কলিকাতা ও ঢাকায় দু'চারিজন সুযোগ্য বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার ফলে আমরা বাঙালীর খাদ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ইদানীং কতকগুলি নূতন জ্ঞান লাভ ক'রলেও, বাংলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে, জনসাধারণের সংস্পর্শে এসে তাহাদের দৈনন্দিন খাদ্য-সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে,

---

* জয়শ্রী—আষাঢ়, ১৩৪৮।

কোন গবেষণাগারের উচ্চ-আসন হ'তে, অথবা কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের অভ্যন্তরে বসে সেটুকু জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। আমরা পূর্ণ একমাসকাল কলিকাতা ও সহরতলীগুলিতে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চাটগাঁ, ফরিদপুর, বগুড়া, মালদহ, দার্জ্জিলিং, কার্শিয়াং প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের অনেকগুলি স্থানে বাংলাসরকারের অধীনে পরিচালিত পরিপুষ্টিতথ্য-সংগ্রহের কার্য্য দেখেছি, সহরে ও গ্রামে অনেকগুলি গৃহের স্বাস্থ্য ও খাদ্যসম্বন্ধে নিজেরাই অনুসন্ধান করেছি, তার উপর ছেলে ও মেয়েদের ইস্কুল-কলেজগুলিতে গিয়ে ভাইটামিন ও ধাতব-খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় অংশগুলির অভাব-ঘটিত স্বাস্থ্য-হীনতা ও রোগের পরিমাণ নিজের চোখে দেখে এসেছি এবং ইস্কুল-কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক অনেকগুলি বিদ্যালয়ে অধুনা-প্রবর্ত্তিত টিফিনের সময় স্বল্পব্যয়ে খাদ্য-বিতরণ ও তার ফলে বালক-বালিকাদের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণও লক্ষ্য ক'রে এসেছি। সত্যই এ এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা! এই নূতন অভিজ্ঞতার ফলে বাঙালীর খাদ্যের দোষগুণ সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান লাভ হয়েছে, তারই উপর নির্ভর ক'রে আমি বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্যের গুণাগুণ বিচার ক'রে, কি ক'রে স্বল্পব্যয়ে খাদ্যের পরিপুষ্টির অভাবগুলি পরিপূরণ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা ব'লব।

বাংলাদেশের নিউট্রিশন অফিসারের অধীনে খাদ্যতথ্যানু-সন্ধানের (Diet survey) ফলে যতটুকু জানা গেছে তাতে বাঙালীর সাধারণ খাদ্যে প্রোটীন-জাতীয় অংশের খুব অভাব

লক্ষিত হয় না, যদিও বহুকাল পূর্ব্বে ম্যাক্‌কে এবং কিছুকাল পূর্ব্বে উইল্‌সন ও আহ্‌মদের মতে বাংলাদেশে প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের স্বল্পতাই বাঙালীর পরিপুষ্টির মুখ্য অন্তরায় বলে মনে করা হোত। 'মাছ-ভাতে বাঙালী' এই প্রবচনটি বাঙালী, ধনী হ'তে নির্দ্ধন সকলেই মেনে চলে। যাঁদের কিনে খাবার মত সংস্থান আছে, তাঁরা তরি-তরকারি, শাকসবজির পরিবর্ত্তে মাছকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, এবং যাঁদের পয়সার অভাব, তাঁরা কেউ অন্য দ্রব্যাদির বিনিময়ে আবার কেউ বা পাড়াগাঁয়ে নদ, নদী, খাল, বিল ও পুকুরের প্রাচুর্য্য-হেতু যে কোন মতে যৎসামান্য মাছ সংগ্রহের চেষ্টার ত্রুটি করেন না। তার উপর মুগ, মসূর, ছোলা, অড়হর প্রভৃতি দালেও প্রোটীন-জাতীয় অংশ প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং এমন বাঙালীর বাড়ী বোধ হয় একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে দিনে অন্ততঃ এক বেলায়ও দালের বরাদ্দ নেই। অবশ্য প্রশ্ন হ'তে পারে, দালের প্রোটীন সহজপাচ্য নয়, তা' হ'লেও যারা প্রত্যহ খেতে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে এই প্রোটীন যে একেবারে অনুপযোগী তা' বলা যায় না। তা'ছাড়া সম্প্রতি বাঙ্গালোরে ও ঢাকায় গবেষণার ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, চালের প্রোটীন-জাতীয় অংশ শরীর-সংগঠনের জন্য গমের প্রোটীন-জাতীয় অংশ হ'তে গুণানুসারে শ্রেয়ঃ। সুতরাং 'ভেতো' বাঙালীর খাদ্যে প্রোটীনের অভাব, পরিমাণে অথবা গুণানুসারে; একথা খুব জোর গলায় বলা চলে না।

এর পর আসে চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যাংশের কথা। সরিষার তেলের প্রচলন বাংলার সর্ব্বত্র এবং ধনী-নির্দ্ধন-নির্ব্বিশেষে বাঙালীরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে এ তেল খাদ্যের বিশেষ অংশরূপে ব্যবহার ক'রে থাকেন। চর্ব্বিজাতীয় ও শর্করাজাতীয় খাদ্য দেহের উত্তাপ-বৃদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতা-বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। সুতরাং একটির অভাবে অপরটির প্রাচুর্য্যের দ্বারা কাজ চলে যায়। যারা পয়সার অভাবে খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তেল খেতে পারে না, ভাতের প্রাচুর্য্য তাদের এই অভাবটুকু অনায়াসে পূরণ ক'রতে পারে। কিন্তু অন্যদিক্ দিয়ে বাঙালীর খাদ্যে জন্তুর চর্ব্বির যে অত্যন্ত অভাব, তা' অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। ফলে, অঙ্গাঙ্গিভাবে ভাইটামিন-'এ'রও যে সে অনুপাতে অভাব ঘটবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এর কারণ যে একমাত্র ঘি, মাখন প্রভৃতির দুর্ম্মূল্যতা, তা' নয়, দুষ্প্রাপ্যতাও তার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

বাঙালীর খাদ্যে শর্করার পরিমাণ অত্যধিক, এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু বাঙালীরা কেন ভাত বেশী পরিমাণে খায় এবং সেই পরিমাণে আটার রুটি খায় না, তা' অনেকেই ভেবে দেখেন না। ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চলে বৎসরে চল্লিশ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হয়, সে সকল প্রদেশে গমের চাষ ভাল হয় না, বরং ধানই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। প্রধানতঃ, এ কারণেই বাংলার ন্যায় মাদ্রাজ, আসাম, হিমালয়ের তরাই অঞ্চল এবং কাশ্মীর প্রভৃতি

স্থানে গমের পরিবর্ত্তে চালই লোকের মুখ্য খাদ্য। তার উপর চালকে সিদ্ধ ক'রলেই ভাত হয়, সুতরাং তার জন্য বেশী পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না; গম সে ভাবে খাওয়া চলে না। গম পিষে আটা প্রস্তুত হয়, সেই আটা মেখে, ড'লে, লেচি ক'রে, বেলে হয় রুটি, তাও আবার ভাল ক'রে সেঁকতে হয়; সুতরাং গম হ'তে আরম্ভ ক'রে সুখাদ্য রুটি পর্য্যন্ত স্তরগুলি অনেকটা আয়াস-সাধ্য। উপরন্তু এ সকল অঞ্চলে জলীয় হাওয়ার জন্য ঘরে আটা বেশীদিন মজুত রাখাও চলে না এবং অন্যপ্রদেশ হ'তে আমদানি ক'রতে হয় ব'লে আটার দাম চাল থেকে অনেক বেশী পড়ে। এসকল নানাকারণে বাঙালী, সখ ক'রে নয়, একরকম দায়ে পড়েই 'ভেতো' অপবাদ নিতে বাধ্য হয়। তার উপর দরিদ্র যারা, তারা খাদ্যে চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের অল্পতাবশতঃ উপযুক্ত কার্য্যক্ষমতা-লাভের জন্য কমখরচে খাদ্যে ভাতের পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে নিজের অজ্ঞাতসারে শরীরের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, যারা খেটে খায়, তারা আতপচালের পরিবর্ত্তে সিদ্ধচালই বেশী পছন্দ করে। জিজ্ঞাসা ক'রলে বলে যে, সিদ্ধচালে নাকি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উদর পূর্ণ থাকে এবং পুনরায় খিদে পেতে সময় লাগে। আতপচাল অপেক্ষা সিদ্ধচাল হজম হ'তে অধিক সময় লাগে কি না, তা' পরীক্ষা-সাপেক্ষ; কিন্তু সিদ্ধচালে যে আতপচাল অপেক্ষা প্রোটীন, ক্যাল্‌সিয়াম্‌ ও ফস্‌ফরাস্‌ এবং ভাইটামিন 'বি,' অনেক

বেশী থাকে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যখন ধানকে সিদ্ধ করা হয়, তখন ঐ পদার্থগুলি চালের উপরের লালচে পাতলা আবরণ থেকে তণ্ডুলকণার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; সুতরাং কলে ছাঁটা হ'লেও সেগুলি আতপচালে যতটা নষ্ট হয়, সিদ্ধচালে ততটা নষ্ট হ'তে পারে না। তবে প্রায়ই দেখা যায় যে, ভাত প্রস্তুত ক'রবার পূর্ব্বে চাল অসংখ্যবার ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়, তা'তে চাল ঢেঁকি-ছাঁটাই হউক, আর কলে ছাঁটাই হউক, ঐ সকল অত্যাবশ্যক পদার্থগুলি জলের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। তারপর যখন ভাত সিদ্ধ হ'লে উত্তমরূপে ফেন গেলে তা'ও ফেলে দেওয়া হয়, তখন ভাতে শুধু শর্করা-জাতীয় দ্রব্য ছাড়া আর বিশেষ কিছুই থাকে না। সুতরাং ক্রমাগত অধিক পরিমাণে ভাত খেলে যকৃৎ ও অন্যান্য পরিপাক-যন্ত্রের উপর অত্যধিক চাপের ফলে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হ'তে পারে; এজন্যই খাদ্যে ভাতের পরিমাণ যা'তে অত্যধিক না হয়, সে-দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

খাদ্য-তথ্য-অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, আমাদের খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়াম্, ফস্‌ফরাস্, লোহা প্রভৃতি ধাতব-লবণের পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম থাকে। প্রথমোক্ত দুটির পরিমাণ দুধে বেশী থাকে, সুতরাং দুধ একটি অত্যাবশ্যক খাদ্য। কিন্তু আজকাল নানাকারণে বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই দুধের বিশেষ অভাব এবং শতকরা নব্বইজনের পক্ষে দুধ খাওয়া একটা দুর্ম্মূল্য বিলাসেরই নামান্তর। যে প্রদেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী, সেখানে চাষবাস ও স্বাস্থ্য

সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভূমি ও গোধনের উপর। গরুর সাহায্যে আমরা চাষ করি, আবার গরুর দুধও খাই। সুতরাং আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা ও চাষবাষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত গরুর খাদ্যের সুব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি না থাকাতে বাংলাদেশের সর্ব্বত্র গোচারণ-ভূমির একান্ত অভাব। তার উপর সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যহ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যের জন্য লক্ষ-লক্ষ মণ দুধ হ'তে অনেক সার পদার্থ ফেলে দিয়ে ছানা প্রস্তুত করি। এ রকম অবস্থায় বাঙালীর খাদ্যে যে দুধের অভাব ঘটবে এবং ফলে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের অভাব-হেতু দেহের দীর্ঘতা ও স্বাস্থ্য বংশপরম্পরানুসারে ক্ষুণ্ণ হ'তে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আমাদের খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের যতটা অভাব, আপাত-দৃষ্টিতে ফস্‌ফরাসের অভাব ততটা না হ'লেও ক্যাল্‌সিয়ামের অভাবে ফস্‌ফরাস্‌ কোন কাজ ক'রতে পারে না। মাছে, ভাতে, তরি-তরকারিতে ফস্‌ফরাস্‌ যা' আছে, পরিমাণে তা' প্রয়োজন মিটাতে পারে, কিন্তু শস্যজাতীয় পদার্থে অধিক পরিমাণে ফাইটিন্‌ (phytin) থাকাতে ইহা দেহের কোন কাজেই লাগে না। ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস্‌ একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংবদ্ধ। যদি খাদ্যে যথোপযুক্ত ক্যাল্‌সিয়াম থাকে, তা' হ'লে ফস্‌ফরাস্‌ ফাইটিনের প্রভাব হ'তে মুক্ত হয় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা হ'তে সক্রিয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এজন্য বাঙালীর খাদ্যে যদিও ফস্‌ফরাসের

পরিমাণ খুব কম নয়, তবু উপযুক্ত পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়ামের অভাবে যেটুকু ফস্‌ফরাস্‌ আছে, তা'ও কোঁন কাজে লাগে না, সুতরাং গৌণভাবে ফস্‌ফরাসের অভাব-জনিত লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়।

খাদ্যে লোহার অভাব হওয়া কিছুতেই উচিত নয়, কেন না অতি অল্পখরচেই লতাপাতা, শাক প্রভৃতি হ'তে এই সামগ্রী অনায়াসে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বাঙালীর খাদ্য-সম্বন্ধে বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, অজ্ঞতাবশতঃ অনেকস্থলেই এই সুলভ শাক প্রভৃতিকে গরুঘোড়ার খাদ্যবস্তু মনে ক'রে তা' বর্জ্জন করা হয়। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে লোহার অভাবে রক্তশূন্যতা ও পরে দেহের অবসন্নতা দেখা দেয়। খাদ্যে শাক ও লতাপাতার অভাবে অনেক সময়ে কোষ্ঠবদ্ধতাও জন্মে।

এর পর আসে খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় আব একটি বিশিষ্ট অংশ ভাইটামিনের কথা। ভাইটামিন 'এ' ও 'বি,'-এর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ কবা হয়েছে। ভাইটামিন 'বি,'-এর অভাব অবহেলা ও অজ্ঞতার জন্যই হয়ে থাকে। ঢেঁকিছাঁটা চাল ও ফেনভাত খেলে কিছুতেই খাদ্যে এই প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অভাব হ'তে পারে না। বাঙালীর খাদ্যে ফলমূলকে একটা অতি-অনাবশ্যক দ্রব্য বলে মনে করা হয়। যাঁদের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল, কেবল তাঁরাই সংবৎসরে নানারকমের ফলমূল আহার করেন। সর্ব্বসাধারণ কেবল মরসুমী ফল ছাড়া (যেমন আমের সময় আম, কমলালেবুর

সময় কমলালেবু প্রভৃতি) কদাচিৎ অন্য ফলের আস্বাদ গ্রহণ ক'রতে পারে। একে ত বাংলাদেশে ফলের চাষ খুবই কম, তার উপর বড়-বড় সহর ছাড়া অন্যত্র অজ্ঞতা ও দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ ফলের চাহিদাও খুব কম। এজন্যই ফলের অভাবে ভাইটামিন 'এ'র প্রাথমিক উপাদান ক্যারোটিন নামক পদার্থ ও ভাইটামিন 'সি'র অভাব ঘটে। ওদিকে জান্তব চর্ব্বির অভাবে ভাইটামিন 'এ'র অভাবহেতু নানা চক্ষুরোগ, চর্ম্মরোগ ও পরিপুষ্টির অভাব দেখা দেয়। আবার খাদ্যে ফলেব অভাবে ভাইটামিন 'সি'র অভাবহেতু, স্কার্ভি ও নানা মারাত্মক সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। যদিও ভাইটামিন 'বি$_2$'-এর অভাব-জনিত পেলাগ্রা-নামক ব্যাধি এদেশে বিরল, তবু কখনও কখনও ঠোঁটের কোণে ও জিহ্বার উপরে পেলাগ্রাজাতীয় ঘা দেখতে পাওয়া যায়। দুধ, মাংস প্রভৃতির অভাবেই এরূপ ঘটে। প্রোটীনের কথা ব'লতে গিয়ে ইচ্ছা ক'রেই মাংসের উল্লেখ করি নি, কেন না বাংলাদেশে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কেউই পর্ব্বাদি উপলক্ষ ছাড়া মাংস বড় একটা আহার করেন না।

এই ত গেল আমাদের খাদ্যে দোষ-ত্রুটির মোটামুটি একটা আভাষ। এখন অল্পখরচে বাঙালীর খাদ্যকে যে উপায়ে যথোপযুক্ত ও সুসমঞ্জস করা সম্ভব, দু'চার কথায় তা'রই কিছুটা নির্দ্দেশ নিম্নে দেওয়া গেল।

আহারের তালিকায় ভাতের পরিমাণ যা'তে দিনে

কিছুতেই দেড়পো'র বেশী না হয়, তাই করা উচিত।* ঢেঁকিছাঁটা আতপচাল অথবা সিদ্ধচালই সর্ব্বদা খাওয়া আবশ্যক। চাল বেশী ধোওয়া উচিত নয় এবং যা'তে ফেন সমস্তই ভাতে থাকে, তাই করা উচিত। সম্ভব হ'লে দিনে একবার ভাতের সঙ্গে দু'চারখানি আটার রুটি অথবা পুরী খেলে ভাল হয়। খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করা উচিত, অন্যথায় ভেজাল অথবা দূষিত তেলের জন্য শোথ প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে। প্রত্যহ সম্ভবপর না হ'লেও অন্ততঃ মাঝে মাঝে ঘি, মাখন প্রভৃতি কিছু কিছু খাওয়া উচিত। বাঙালীর খাদ্যে দাল-ভাতের সঙ্গে মাছের প্রাধান্যটুকু ঠিক রাখতে হবে। মাংস না হ'লেও চলে, যদি খাদ্যে দুধ ও ডিম প্রভৃতির দ্বারা তার অভাব পূরণ করা হয়। মোটকথা, খাদ্যের প্রোটীনের মোট পরিমাণের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ প্রাণিদেহজাত প্রোটীন হওয়া চাই। সম্ভব হ'লে সকলেরই, অন্যথায় শিশু, রোগী ও প্রসূতির পক্ষে দুধপান অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি অর্থাভাবে তা' সম্ভবপর না হয়, তা'হলে প্রত্যহ ৫ হ'তে ১০ গ্রেণ ক্যাল্সিয়াম ল্যাক্টেট্, অথবা ডাইক্যাল্সিয়াম ফস্ফেট খাওয়া উচিত; এতে খাদ্যের ক্যাল্সিয়াম ও ফস্ফরাসের অভাব কতক পরিমাণে দূর হ'তে পারে। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে লতাপাতা ও শাক-সবজি খাওয়া উচিত, কেন না তা'তে কোষ্ঠবদ্ধতা ও

* রেশন-প্রথার কল্যাণে ভাতের পরিমাণ বাধ্যতামূলক ভাবেই সকলকে কমাতে হয়েছে।

রক্তশূন্যতা দূর হয়। বাঙালীর খাদ্যে ফলমূলের অংশ অবশ্যই বাড়া'তে হবে, যাতে ক্যারোটিন, ভাইটামিন 'সি' প্রভৃতির অভাব না হ'তে পারে। অভাবে সদ্যো-অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ প্রভৃতি এবং টমেটো, লেটুস্-শাক, শশা, বিট প্রভৃতি কাঁচা খাওয়া উচিত। কিন্তু এগুলি তার পূর্ব্বে পটাস্-পারমাঙ্গানেট দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। শাক-সবজি বেশীক্ষণ সিদ্ধ অথবা ভাজা ক'রে খাওয়া উচিত নয়, কেন না তা'তে ভাইটামিন 'সি' একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যায়। গরম তেল কি ঘিয়ে দু'তিন মিনিট ঢাকা অবস্থায় ভাজলে এ ভাইটামিনটি ততটা নষ্ট হয় না, যতটা অনেকক্ষণ ধ'রে ভাজলে অথবা সিদ্ধ ক'রলে নষ্ট হয়। ভাইটামিন 'বি$_2$'-এর প্রয়োজন অল্পাধিক দুধে অথবা মাংসে মিট্‌তে পারে।

এই গেল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে প্রদেশের গবর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। জনস্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তব্য, খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা দূর করা এবং প্রয়োজন হ'লে বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্ত্তন করে চালের কলগুলি যা'তে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল পরিষ্কার না করে এবং মিষ্টান্নব্যবসায়ীরা ছানাকেটে দুধের সারাংশ যাতে অযথা নষ্ট না করে তারও ব্যবস্থা করা। কৃষিবিভাগের কর্ত্তব্য, লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রদেশের খাদ্য প্রদেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং গরুর খাদ্যেরও ব্যবস্থা ক'রে গোজাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দেশে দুধের পরিমাণ বাড়ানো। এ প্রদেশে যাতে ফলের চাষ বৃদ্ধি পায়, তারও ব্যবস্থা

ক'রতে হবে কৃষি-বিভাগকে। তার উপর মৎস্যচাষ-বিভাগের উপর চাপ দিয়ে যাতে পুকুর, বিল প্রভৃতিতে উপযুক্ত মাছের চাষ হয় এবং মাছের পেটে যখন ডিম থাকে, তখন যা'তে যদৃচ্ছামত তা'দের বিনাশ করা না হয়, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। উপরন্তু হাঁস, মুরগী প্রভৃতির প্রতিপালনে যা'তে দেশে ডিমের উৎপাদন অধিক পরিমাণে হয়, তা'ও ক'রতে হবে। এককথায় স্বাস্থ্য-বিভাগ ও কৃষি-বিভাগকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন ক'রে, সমবেতভাবে একই উদ্দেশ্যে নিজেদের সকল শক্তি নিয়োগ ক'রতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের বাঙালীর খাদ্যের ত্রুটি ও তাহার প্রতিকার *

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রবাসের বাঙালী ভদ্রমহোদয়গণের নিকট যে নিবেদন প্রচারিত হয়েছে, তাতে সর্ব্বপ্রথমেই বাঙালীর অন্নসমস্যার কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। বাস্তবিকই অন্নসমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা আর নেই। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'তে হ'লে চাই সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন এবং সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের জন্য চাই উপযুক্ত খাদ্য। আবার উপযুক্ত খাদ্যের জন্য উপযুক্ত অর্থেরও প্রয়োজন। সুতরাং অন্নসমস্যাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়,—প্রথমতঃ উপার্জ্জন-সমস্যা, আর দ্বিতীয়তঃ খাদ্য-সমস্যা। আজ আমি এই শেষোক্ত বিষয়—বাঙালীর খাদ্য-সমস্যার সম্বন্ধে কিছু ব'লব।

স্যার রবার্ট্ ম্যাক্ক্যারিসন কুনূরে ভারতবর্ষের নানা-জাতীয় লোকদের খাদ্য-সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন, তাতে দেখা যায়, শিখেরা সব চেয়ে বেশী পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে, তৎপরে পাঠান, তৎপরে মারাঠী,

---

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পাটনা-অধিবেশনে (১৯৩৭) বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিরূপে গ্রন্থকারের অভিভাষণ।

তৎপরে গুর্খা, তৎপরে কানাড়ী তৎপরে বাঙালী ও সর্ব্বশেষে মাদ্রাজীরা। তিনি কতকগুলি ইঁদুরকে সাত ভাগে বিভক্ত ক'রে ঐগুলিকে ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় খাদ্য দিতে থাকেন। ঐ ইঁদুরগুলির প্রত্যেক দলের ওজন গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ ক'রবার সময় সমান ছিল।

আশি দিন পরে দেখা গেল যে, শিখ-খাদ্য-গ্রহণকারী ইঁদুরগুলি শতকরা ষাট, পাঠান-খাদ্য-গ্রহণকারীগুলি শতকরা সাতান্ন, বাঙালীর খাদ্য-গ্রহণকারী দল মোটে তেত্রিশ ও মাদ্রাজী-খাদ্যভোজী দল মাত্র শতকরা তেইশ গ্রাম ওজনে বেড়েছে। শুধু তাই নয়, ইঁদুরগুলির স্বাস্থ্যের অবস্থা চোখে দেখেই বুঝতে পারা গেল যে, শিখ ও পাঠান-খাদ্য অপেক্ষা বাঙালী এবং মাদ্রাজী-খাদ্য অনেকাংশে নিকৃষ্টতর, কেন না প্রথমোক্ত খাদ্যভোজী ইঁদুর-গুলি সুপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান্ এবং শেষোক্ত খাদ্যগ্রহণকারী দলগুলি তুলনায় অত্যন্ত রুগ্ন ও স্বাস্থ্যহীন ছিল। তিনি আরও দেখতে পান যে, খাদ্যের পরিপুষ্টি-শক্তির উপর কতকগুলি রোগের প্রকোপ ও বিস্তার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি কুষ্ঠব্যাধির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই কুষ্ঠব্যাধির প্রাদুর্ভাব যে পাঞ্জাবে এত কম এবং মাদ্রাজে ও বঙ্গদেশে এত বেশী, তার কারণ পুষ্টিকারিতা-হিসাবে পাঞ্জাবীদের খাদ্যের শ্রেষ্ঠতা এবং মাদ্রাজী ও বাঙালীদের খাদ্যের নিকৃষ্টতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে যত জাতীয় খাদ্য আছে,

তাদের মধ্যে মাদ্রাজী ও বাঙালীর খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। এর কারণ কি ?
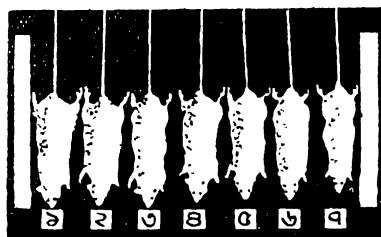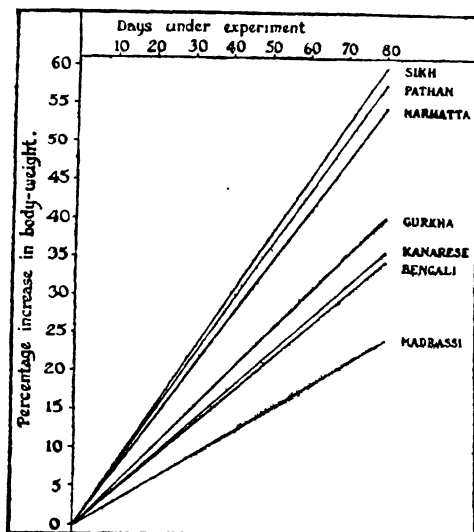
চিত্র, ১

ম্যাক্‌ক্যারিসনের গবেষণানুযায়ী শিখ-খাদ্য ও পাঠান-খাদ্যের তুলনায় বাঙালী ও মাদ্রাজী-খাদ্যের নিকৃষ্টতা

(১) শিখ-খাদ্য-গ্রহণকারী ইঁদুর (২), (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৭) যথাক্রমে পাঠান, মারাঠা, গুর্খা, কানাড়ী, বাঙালী ও মাদ্রাজী-খাদ্য-গ্রহণকারী ইঁদুরসমূহ।

এই প্রশ্ন বা সমস্যা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে খাদ্য-সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। প্রত্যেক খাদ্যবস্তুর মধ্যেই প্রোটীন, চর্ব্বি, শর্করা, ভাইটামিন ও লবণ-জাতীয় পদার্থ ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে এবং এই সব কয়টি খাদ্যাংশই স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়। এগুলির মধ্যে প্রোটীনকে দৈহিক পরিপুষ্টিসাধক, চর্ব্বি ও শর্করাকে কার্য্যক্ষমতাদায়ক এবং ভাইটামিন ও ভিন্ন-ভিন্ন ধাতব লবণকে দেহ-সংরক্ষক উপাদান বলা হয়। সুস্থ-শরীর ধারণ ক'রতে হ'লে সাধারণ পরিশ্রমী একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ৬৫ গ্রাম প্রোটীন, ৬০ গ্রাম চর্ব্বি, ৩৫০ গ্রাম অথবা ততোধিক শর্করা, ০·৬৮ গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম, ১ গ্রাম ফস্‌ফরাস্‌, ২০ মিলিগ্রাম লোহা, ২৫ মিলিগ্রাম আয়োডিন, ভাইটামিন 'এ' ৩০০০ ইউনিট, 'বি$_{১}$' ৩০০ ইউনিট, 'সি' ৩০ হ'তে ৫০ মিলিগ্রাম এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন 'বি$_{২}$' এবং 'ডি' আবশ্যক। মেয়েদের পক্ষে অল্পকিছু কম হ'লেও চলে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান-পালনের সময়ে তাঁদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য দেওয়া উচিত। শিশু এবং বালক-বালিকাদেরও উপযুক্ত দেহবৃদ্ধির জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

প্রোটীন, চর্ব্বি ও শর্করা এই তিনটি খাদ্যাংশ হ'তে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপের পরিমাপ ঠিক করা হয় ক্যালরি (calorie) হিসাবে। সাধারণতঃ রসায়ন-শাস্ত্রে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে যে ক্যালরির উল্লেখ আছে,

শরীর-বিজ্ঞানের উত্তাপ-পরিমাপক ক্যালরি তা' হ'তে পৃথক্। এক হাজার গ্রাম ওজনের জলের উত্তাপ ১ ডিগ্রী বাড়াতে যে পরিমাণ উত্তাপ আবশ্যক, তাই শরীর-বিজ্ঞানের বড় ক্যালরি। এক গ্রাম প্রোটীন হ'তে এই রকম ৪.১ ক্যালরি, এক গ্রাম চর্ব্বি হ'তে ৯.৩ এবং এক গ্রাম শর্করা হ'তে ৪.১ ক্যালরি উত্তাপের সৃষ্টি হয়। একজন সাধারণ পরিশ্রমী লোকের পক্ষে দৈনিক ২৪০০ ক্যালরি উত্তাপের আবশ্যক। অতি-পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে কার্য্যানুসারে ২৮০০ হ'তে ৩২০০ ক্যালরি উত্তাপের প্রয়োজন। চর্ব্বি এবং শর্করা হ'তে অতিসহজেই উত্তাপ পাওয়া যায় এবং উত্তাপ হ'তে কার্য্যক্ষমতা আসে, সেজন্য এদের নাম কার্য্যক্ষমতাদায়ক খাদ্যাংশ। প্রোটীন হ'তে যদিও উত্তাপ পাওয়া যায়, তথাপি দেহের ক্ষয়-নিবারণ ও পরিপুষ্টির জন্য এই উপাদানটি অত্যাবশ্যক ব'লে সাধারণতঃ প্রোটীনের উত্তাপ কার্য্যক্ষমতায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায় না, কিন্তু যদি কোন কারণে চর্ব্বি অথবা শর্করার পরিমাণ খাদ্যে কম থাকে, অথবা অর্দ্ধাশনে কিংবা অনশনে লোক কঠিন পরিশ্রম ক'রতে থাকে, তা' হ'লে খাদ্যের প্রোটীন, দেহের চর্ব্বি অথবা চর্ব্বিহীন দেহের মাংসপেশীগুলি পর্য্যন্ত প্রথমতঃ উত্তাপে এবং পরে কার্য্যক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। এজন্য খাদ্য অনুপযুক্ত অথবা পরিমাণে কম হ'লে শরীর-ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যও সর্ব্বদা খাওয়া উচিত নয়, কেন না তা' হ'তে উদ্ভূত প্রয়োজনাতিরিক্ত

উত্তাপ চর্ব্বিতে রূপান্তরিত হয় এবং মেদবৃদ্ধির দ্বারা শরীরকে অকর্ম্মণ্য ক'রে দেয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য-ভক্ষণের ফলে সময়ে সময়ে শরীরের নানা-অংশের উপর অত্যন্ত গুরু-চাপ পড়ে এবং ফলে বহুমূত্র, যকৃৎ ও মূত্রাশয় প্রভৃতির পীড়া জন্মে।

খাদ্যের ভাইটামিন ও ধাতব লবণগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। ঐগুলির অভাবে নানারকমের রোগ জন্মে ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এজন্য এগুলিকে দেহ ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষক খাদ্যাংশ বলা হয়। গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান-পালন-সময়ে জননীর পক্ষে এবং বৃদ্ধিশীল শিশু ও বালকবালিকার পক্ষে এই অত্যাবশ্যক দেহ ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষক খাদ্যাংশগুলি প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষাও পরিমাণে বেশী প্রয়োজন।

বিংশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ম্যাক্‌কে এদেশীয় জেলের এবং বাঙালী ছাত্রদের খাদ্য-সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে স্থির করেন যে, বাঙালীর খাদ্যে প্রোটীনের অভাবই বাঙালীদের দেহের অপরিপুষ্টির কারণ। শরীরতত্ত্ববিদ্ ভয়েটের মতানুসারে দৈনিক ১০০ গ্রাম প্রোটীনের আবশ্যক; কিন্তু অন্য আর একজন বিজ্ঞানী চিটেন্‌ডন দেখান যে, প্রোটীনের পরিমাণ খাদ্যে ৪০-৫০ গ্রাম হ'লেও চলে, যদি অন্যান্য খাদ্যাংশ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই শেষোক্ত মতানুযায়ী দরিদ্র বাঙালীর খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণ অনেকটা কম হ'লেও মধ্যবিত্ত বাঙালীর খাদ্যে তা' উপযুক্ত পরিমাণেই আছে। সুতরাং মধ্যবিত্ত

বাঙালীর ক্ষীণদেহের একমাত্র কারণ প্রোটীনের অল্পতা, এটা জোর ক'রে বলা চলে না। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই খাদ্যবিজ্ঞানের একটি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয় এবং ইতিপূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত খাদ্যের অত্যাবশ্যক অংশ ভাইটামিনের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে মধ্যে মধ্যে 'বেরিবেরি' রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। বাঙালীর খাদ্যে বিশেষতঃ কলে-ছাঁটা চালে ভাইটামিন 'বি,'-এর অভাব এই রোগের মূল কারণ ব'লে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক বিজ্ঞানী বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্যে ভাইটামিন 'এ'-রও অভাব লক্ষ্য ক'রে মত দিলেন যে ভাইটামিনগুলির অভাবই বাঙালীর দৈহিক হীনবলের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

সম্প্রতি আমরা অন্নজীবী ভারতীয়দের (বাঙালী, মাদ্রাজী প্রভৃতি) সাধারণ খাদ্য কি ভাবে স্বল্পব্যয়ে অধিকতর পুষ্টিকর ও উপকারী করা যায়, এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি। এতে দেখা গেল যে, দুধ, মাখন-তোলা দুধ, অথবা নিউজিল্যাণ্ড হ'তে এদেশে আনীত মাখন-তোলা দুধের গুঁড়ার (skimmed-milk powder) দ্বারা এ-সকল খাদ্যের পুষ্টিকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গরীব লোকেরা দুধ, এমন কি মাখন-তোলা দুধই বা কিন্‌বে কি দিয়ে? সুতরাং আমরা খাদ্যের সহিত ক্যাল্‌সিয়াম এবং ফস্‌ফরাস আলাদা আলাদাভাবে এবং একসঙ্গে মিশিয়ে চারিদল ইঁদুরকে দিতে আরম্ভ ক'রলাম। প্রথম দলকে শুধু দাল, চাল, তেল, বেগুন, কাঁচকলা, নটেশাক,

ভেড়ার মাংস এবং নারিকেল দেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় দলের খাদ্যে এর সঙ্গে ১·৭৮ গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট, তৃতীয় দলের খাদ্যে ০·৮৯ গ্রাম ক্ষারধর্ম্মী পটাসিয়াম ফস্‌ফেট এবং চতুর্থ দলকে উপরন্তু একই পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট ও ক্ষারধর্ম্মী পটাসিয়াম ফস্‌ফেট দুই-ই দেওয়া হ'ল। প্রত্যেক দলে দুইমাস বয়সের বারোটি ক'রে ইঁদুর ছিল এবং তা'দিগকে এইভাবে দশ-সপ্তাহ খাদ্য দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে তাদের ওজন নেওয়া হ'ত। এইরূপ খাদ্য-ব্যবস্থার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে প্রত্যেক দলের গড়পড়তা ওজন ছিল ৫৪·৬ গ্রাম, কিন্তু দশ-সপ্তাহ পরে দেখা গেল যে প্রথম দলের গড়পড়তা ওজন হ'য়েছে ৯৬·৫, দ্বিতীয় দলের ১২১·১, তৃতীয় দলের ৮৭·১ এবং চতুর্থ দলের ১২৯·৭ গ্রাম (চিত্র, ২)। এই থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, প্রথমোক্ত দলটি খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়াম এবং ফস্‌ফরাসের অভাবে সম্যক্ ওজনে বাড়তে পারে নি। ক্যাল্‌সিয়াম খেতে দেওয়াতে দ্বিতীয় দলের খুবই উপকার হ'ল; একসঙ্গে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস দেওয়াতে চতুর্থ দলের ওজন আরো বেশী বৃদ্ধি হ'ল। তৃতীয় দলের শেষ ওজন প্রথম দলের অপেক্ষা কম কেন হ'ল, তার কারণ অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেল যে, তারা আগাগোড়া দশ-সপ্তাহই পরিমাণে প্রথম দলের অপেক্ষাও কম খেয়েছে এবং তাদের অন্ত্রগুলি ও গলগ্রন্থির আভ্যন্তরিক অবস্থা অণুবীক্ষণ-সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এও সিদ্ধান্ত হ'ল যে, যে-কোনও কারণে শুধু ক্ষারধর্ম্মী পটাসিয়াম ফস্‌ফেটকে ইঁদুরেরা খাদ্যে পছন্দ

করে না, সেজন্যই তাদের কোন উপকার হয় নি। সুতরাং পৃথগ্‌ভাবে আরো একদল ইঁদুরকে একই সাধারণ খাদ্যের সঙ্গে অরুচিকর ক্ষারধর্ম্মী পটাসিয়াম ফস্‌ফেট-সহ ক্যাল্‌সিয়াম
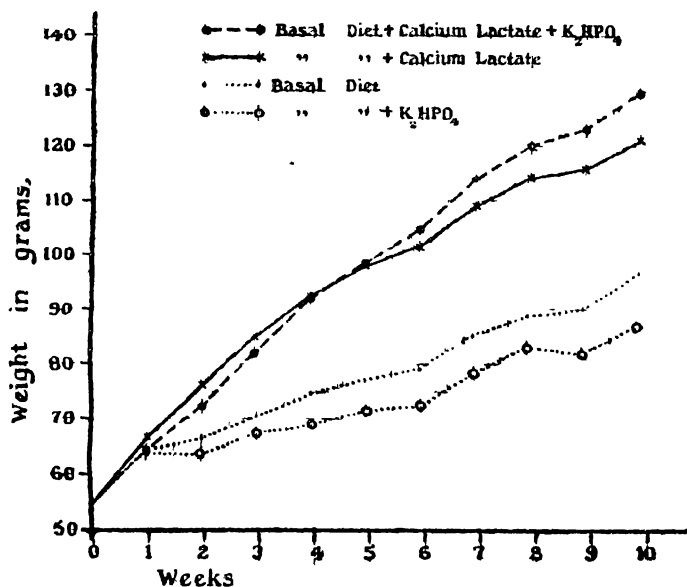
চিত্র, ২

লেখকের গবেষণানুযায়ী চারিদল ইঁদুরের ওজন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র।

ল্যাক্‌টেটের পরিবর্ত্তে একটি ধাতব লবণ ডাইক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেটকে পরিপূরকরূপে দিয়েও অনুরূপ উপকারিতা লক্ষ্য করা হয়েছিল। (চিত্র, ৩)

এই বিভিন্ন দলের রক্তে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস কি মাত্রায় আছে, তা'ও তাদের রক্তপরীক্ষা ক'রে স্থির করা হয়েছিল। ফলে দেখা গেল, প্রথম দলের রক্তে শতকরা ৬'১২ মিলিগ্রাম,

দ্বিতীয় দলের ১৩'১৬ মিলিগ্রাম, তৃতীয় দলের ৮'১২ মিলিগ্রাম এবং চতুর্থ দলের রক্তে শতকরা ১৪ মিলিগ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম আছে। আবার প্রথম দলের রক্তে ফস্‌ফরাসের
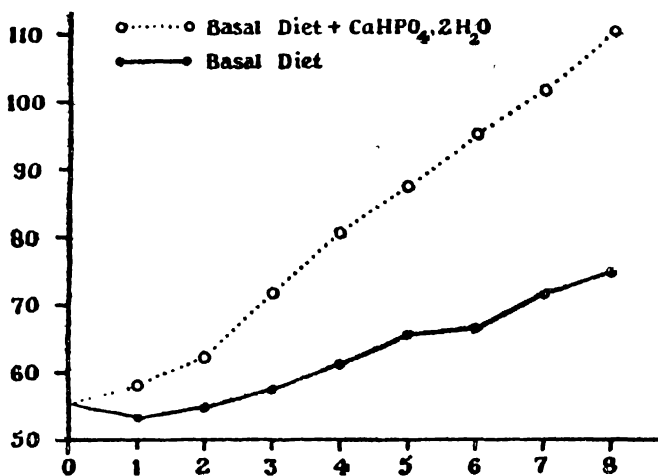
চিত্র, ৩

থাদ্যের পরিপূরকরূপে ডাইক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেটের সাহায্যে অধিকতর দেহবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র।

পরিমাণ শতকরা ১২'৮৯, দ্বিতীয় দলের ১০'৩৯, তৃতীয় দলের ১১'৬৭ এবং চতুর্থ দলের ৯'৩৩ মিলিগ্রাম ছিল। এই তথ্যগুলি হ'তে প্রমাণিত হ'ল যে, প্রথম এবং তৃতীয় দল ইঁদুরের রক্তে ক্যাল্‌সিয়াম সাধারণ অপেক্ষাও কম এবং ফস্‌ফরাস বেশী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দলের দেহে ক্যাল্‌সিয়াম প্রয়োজনাপেক্ষা কিছু বেশী এবং ফস্‌ফরাস ঠিক পরিমাণেই আছে।

উপরন্তু উপগলগ্রন্থির (parathyroid gland)

আভ্যন্তরিক গঠন-পরীক্ষায়ও দেখা গেল যে, প্রথম ও তৃতীয় দলের গ্রন্থির মধ্যে সূক্ষ্ম তন্তুজাল (fibrous tissue) অনেক অধিকপরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং রক্ত-চলাচলের প্রণালীগুলি অনেকাংশে কমে যাওয়াতে ঐ গ্রন্থিগুলির কার্য্যকারিতাও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। অপর দুই দলের গ্রন্থির আভ্যন্তরিক গঠন ঠিকই ছিল। উপগলগ্রন্থির সহিত রক্তের ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের অল্পতার জন্য রক্তে ক্যাল্‌সিয়ামের পরিমাণ খুব কমে গেলে উপগলগ্রন্থির অন্তঃক্ষরণও (internal secretion) কমে যায় এবং ফলে পরিণামে টিটানি (tetany)-নামক রোগ দেখা দেয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় রক্তে ক্যাল্‌সিয়ামের অল্পতার জন্য স্নায়ু-মণ্ডলের আর স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না। স্বভাবতঃ অন্নজীবী বাঙালী ও মাদ্রাজীদের স্নায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা ও ভাবপ্রবণতার মূলে খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের অল্পতাই হয়ত অনেকাংশে দায়ী। এস্থলে কথা উঠতে পারে যে, বাঙালী ও মাদ্রাজীদের মধ্যে 'টিটানি' ত খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। কি জন্য তা হয় না, তারও কারণ আমরা অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি। সকলেই জানেন, সমগ্র মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে এবং বাংলাদেশের অনেকাংশে বিশেষতঃ পূর্ব্ব এবং উত্তর বাংলায় দরিদ্র গৃহস্থেরা অনেকে অধিক পরিমাণে হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি মসলা খাদ্যের সহিত খায়। মসলাগুলিতে সাধারণতঃ ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস পরিমাণে একটু বেশীই

আছে, এবং যদিও এগুলি খাদ্যের সঙ্গে পরিমাণে অল্পই ব্যবহৃত হয়, তথাপি এই স্বল্প ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস দেহ-বৃদ্ধির পক্ষে দৃশ্যতঃ কার্য্যকর না হলেও, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য রক্তে যে পরিমাণ ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের আবশ্যক এদের সাহায্যে তা অব্যাহত থাকে এবং উপগলগ্রন্থিও যথোপযুক্ত অন্তঃস্রাব নিঃসরণ ক'রতে পারে, ফলে আর 'টিটানি' রোগ হয় না। মসলাগুলি এই হিসাবে শরীরের পক্ষে উপকারী হলেও, এগুলি অত্যধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে পাকাশয় এবং অন্ত্রগুলির অভ্যন্তরে প্রদাহ ও পরে ক্ষতও দেখা দিতে পারে। এজন্য অন্নজীবীদের খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ বাড়াতে হ'লে দুধ অথবা তজ্জাতীয় খাদ্যই প্রকৃষ্ট।

উপরিউক্ত অনুসন্ধানগুলি হতে অনায়াসেই এটা স্থির করা চলে যে বাঙালী এবং মাদ্রাজীদের খাদ্যে যথোপযুক্ত ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস না থাকাতে তাদের শারীরিক বৃদ্ধিও উপযুক্ত পরিমাণে হতে পারে না। এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্য গবেষকগণ আরও দেখিয়েছেন যে খাদ্যে লৌহের স্বল্পতাই এতদ্দেশীয় লোকদের সাধারণতঃ রক্তহীনতা ও পাণ্ডুরতার জন্য দায়ী। বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্য-সম্বন্ধেও এই অভিমত অনেকাংশে প্রযোজ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র বাঙালীর খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটীন, স্নেহ-পদার্থ, ভাইটামিন এবং ধাতুগুলির একান্তই অভাব। মধ্যবিত্ত এবং সচ্ছল অবস্থাপন্ন বাঙালীর খাদ্যেও এগুলির এক বা

ততোধিক উপাদানের অভাবেই বাঙালীর দেহ ও মনের উন্নতি অন্যান্য প্রদেশের লোকের তুলনায় কম হ'য়ে থাকে।

বাঙালীর সাধারণ খাদ্যে অভাব কিসের এবং কি ভাবে তার পরিপূরণ করা যেতে পারে, আমি অতঃপর সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা ব'লব।

আয়ের তারতম্যানুসারে খাদ্যকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) দরিদ্র বাঙালীর খাদ্য, (২) মধ্যবিত্ত বাঙালীর খাদ্য এবং (৩) সঙ্গতিপন্ন বাঙালীর খাদ্য।

নিম্নে প্রথমেই দরিদ্র বাঙালীর দৈনিক খাদ্যের মোটামুটি একটা তালিকা দেওয়া গেল।

কলে ছাঁটা চাল	আধসের
দাল	এক ছটাক
তেল	১/৪ ছটাক
তরকারি	৩/৪ ছটাক
শাক-সবজি	১/৮ ছটাক
মাছ	১/২ ছটাক
লবণ	প্রয়োজনানুরূপ

মসলা—হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি ১/২ ছটাক।

উল্লিখিত খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণ ৫১ গ্রাম, স্নেহ (চর্ব্বি) ১২ গ্রাম, শ্বেতসার (শর্করা) ৪১৮ গ্রাম, ক্যাল্‌সিয়াম ০·১৭ গ্রাম, ফস্‌ফরাস ০·৭৬ গ্রাম, লৌহ ১৫ মিলিগ্রাম, ভাইটামিন 'এ' ৫০০ ইউনিট, 'বি১' ১৬০ ইউনিট, এবং 'সি' মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম আছে। এই খাদ্যের তাপ-উৎপাদিকা

শক্তি মাত্র ২১৬৩ ক্যালরি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরিমাণে ও কার্য্যকারিতায় এই খাদ্য অতি নিকৃষ্ট এবং অপ্রচুর। এতে কেবল শ্বেতসার ব্যতীত আর অন্যান্য সকল খাদ্যাংশই প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক কম আছে, সুতরাং এই অনুপযুক্ত খাদ্য হ'তে শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় স্বল্প-আয় বাঙালীর খাদ্যের পরিমাণ ও গুণের উন্নতিসাধন না ক'রতে পারলে দেশের শতকরা ৭০ জন বাঙালীকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ করা অসম্ভব। উপরি-উক্ত খাদ্যের মাসিক ব্যয় ৩।০ *। সুতরাং এমন ভাবে খাদ্যের অপ্রচুর অংশগুলির পরিপূরণ ক'রতে হবে, যাতে ব্যয় আর খুব বেশী বৃদ্ধি না পায়, অথচ এর কার্য্যকারিতা ও পুষ্টিশক্তি সুস্থদেহে জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত হ'তে পারে। দরিদ্র বাঙালীর খাদ্যের পরিপূরক-হিসাবে নিম্নলিখিত খাদ্য-বস্তুগুলি দেওয়া যেতে পারে।

লাল আটা	২ ছটাক
ছোলা	১ ছটাক
শাক	১ ছটাক
নারিকেল	১/৪ ছটাক
গুড়	১/৪ ছটাক।

এইরূপ করলে খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণ হবে ৮৬·৫ গ্রাম, স্নেহ ২৪ গ্রাম, শ্বেতসার ৫৮৪·৫ গ্রাম, ক্যাল্‌সিয়াম্ ০·২ গ্রাম, ফস্‌ফরাস্ ০·৮ গ্রাম, লৌহ ২০ মিলিগ্রাম, ভাইটামিন 'এ'

* বর্ত্তমানে প্রায় ১২৲ টাকা।

৩৫০০ ইউনিট, 'বি' ২০০ ইউনিট এবং ভাইটামিন 'সি'-ও যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে। এই খাদ্যের তাপ-উৎপাদিকা শক্তি ২৯০৮ ক্যালরি, সুতরাং খাদ্য প্রস্তুতের সময়ে শতকরা ১০ ভাগ ক্ষতি বাদ দিলেও থাকবে ২৬৭৮ ক্যালরি এবং প্রোটীন ও স্নেহও এইভাবে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৭৮ গ্রাম ও ২১'৫ গ্রাম। এতে ব্যয় বাড়বে মাসিক ১।০ হইতে ১।৶০ আনা * এবং উপকারিতা ব্যয়ের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। কলে ছাঁটা চালের পরিবর্ত্তে ঢেঁকিছাঁটা অথবা সিদ্ধচালের ব্যবস্থাই সমীচীন, কেননা তাতে ভাইটামিন 'বি,' অনেকটা থাকে। আর ছোলার দালের পরিবর্ত্তে অঙ্কুরিত ছোলা, গুড় এবং নারিকেল-সহযোগে শুধু যে উপাদেয় হয় তা' নয়, তাতে শরীর-বৃদ্ধিরও সাহায্য হয়। আমরা সাধারণ খাদ্যের পরিপূরক-হিসাবে অঙ্কুরিত ছোলার উপকারিতা-সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, প্রতিদিন ৬টি ইঁদুরের পক্ষে ½ গ্রাম উদ্গতঅঙ্কুর ছোলা, ০'৮৮ গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেটের মতই কার্য্য করে।

চারি দলের প্রত্যেকটিতে ছ'টি ক'রে ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করার সময়ে তাদের প্রাথমিক গড়পড়তা ওজন ছিল ৫৪'৫ গ্রাম। প্রত্যেক দলের সাধারণ খাদ্য ছিল, লাল আটা, কলে ছাঁটা চাল, ছোলার দাল, অড়হর দাল, কাঁটানটে শাক, বেগুন, লঙ্কা, ধনে ও সরষে-সমন্বিত মিশ্রিত খাদ্য। দ্বিতীয় দলকে পরিপূরক-হিসাবে প্রতিদিন দেওয়া

* বর্ত্তমানে প্রায় ৫৲ টাকা।

হয়েছিল ০·৬ গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট, তৃতীয় দলকে সিকি আউন্স অঙ্কুরিত ছোলা এবং চতুর্থ দলকে ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট সহ একই পরিমাণে অঙ্কুরিত ছোলা।

৮ সপ্তাহ পরে প্রথম দলের গড়পড়তা ওজন হয় ১১৫·৩ গ্রাম, এবং দ্বিতীয় দলের ঠিক একই সময় পরে হয় ১১৯·৫ গ্রাম। চতুর্থ দলকে ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট ও অঙ্কুরিত ছোলা দুইই একসঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সেই দলের ৮ সপ্তাহ পরে গড়পড়তা ওজন দেখা গেল ১২৬ গ্রাম। তবে তফাৎ এই যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ দলের অস্থি অধিক পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম পাওয়াতে প্রথম এবং তৃতীয় দলের অপেক্ষা একটু বেশী বেড়েছে। পালং শাক, নটে শাক, কল্‌মি শাক, পুঁইশাক প্রভৃতি একই সঙ্গে ভাইটামিন ও লৌহের পরিপূরক-হিসাবে খুবই কার্য্যকর। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দরিদ্র বাঙালীর উল্লিখিত নূতন তালিকামত খাদ্যও শিশু, বালক-বালিকা এবং গর্ভবতী এবং সন্তানপালিকা জননীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়; কেননা ঐ সকল অবস্থায় দেহের পক্ষে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস আরও অধিক পরিমাণে আবশ্যক ব'লে খাদ্যে ঐগুলি আরও বাড়ানো উচিত। এই হিসাবে ডিম, দুধ অথবা মাখন-তোলা দুধ কি ঘোলের ব্যবস্থা ক'রতে পারলেই ভাল হয়, কিন্তু এই জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে শতকরা ৫০ জন তা করতে অক্ষম। এ রকম অবস্থায় প্রত্যহ আধ গ্রাম করে ডাইক্যাল্‌সিয়াম্ ফস্‌ফেট অথবা ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট দিলেও অনেকটা সুফল আশা করা যেতে পারে।

অতঃপর মধ্যবিত্ত বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্যের একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া হ'ল।

কলে ছাঁটা চাল	৫ ছটাক
দাল	১½ ছটাক
তরকারি	৩ ছটাক
শাক-সবজি	২ ছটাক
তেল	১ ছটাক
ঘি	½ ছটাক
দুধ	৪ ছটাক
চিনি	১ ছটাক
মাছ	১ ছটাক
লবণ	প্রয়োজনানুরূপ
মসলা—	
হলুদ, লঙ্কা, ধনে, সরষে	½ ছটাক।

এই খাদ্যে প্রোটীন আছে ৫৭·৭ গ্রাম, তন্মধ্যে প্রাণিদেহ হতে আগত মোটে ১৮ গ্রাম, স্নেহ ৯৭ গ্রাম, শ্বেতসার ৩৮০ গ্রাম, ক্যাল্‌সিয়াম ১·২ গ্রাম, ফস্‌ফরাস ১·৫৬ গ্রাম, লৌহ ৫১·৮ মিলিগ্রাম, ভাইটামিন 'এ' ৭০০০ ইউনিটের উপর, 'বি১' ৪০০ ইউনিটের উপর এবং 'সি' ১৭০ মিলিগ্রাম; এবং ইহার তাপ-উৎপাদিকা শক্তি ২৬৪১ ক্যালরি। অতএব দেখা

যাচ্ছে যে এই খাদ্যে প্রোটীন বিশেষতঃ প্রাণিদেহজাত প্রোটীন পরিমাণে কম আছে, শ্বেতসার প্রায় ঠিকই আছে, স্নেহ-পদার্থ প্রয়োজনাতিরিক্তই আছে বলা চলে, ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস এবং লৌহ এবং ভাইটামিনগুলি ('বি,' ছাড়া) পরিমাণে মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে ইহা বলা বাহুল্য যে মধ্যবিত্ত বাঙালীর অনেকের ভাগ্যেই দুধ এবং ঘি আজকাল জুটে না। এ অবস্থায় দুধের অভাবে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস-ঘটিত ধাতব লবণগুলি এবং জীবদেহজাত প্রোটীনের পরিমাণ আরও কমে যায়। সুতরাং এই প্রকারের খাদ্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত না ক'রে প্রথম অর্থাৎ দরিদ্রের খাদ্য-শ্রেণীভুক্ত করাই সমীচীন।

এই তালিকানুযায়ী মধ্যবিত্ত বাঙালীর খাদ্যে যেটুকু ত্রুটি আছে নিম্নলিখিত উপায়ে তার প্রতিকার হতে পারে। দেড় ছটাক দালের মধ্যে আধছটাক ছোলা, অথবা মুগ অঙ্কুরিত অবস্থায় খাওয়া বিধেয়। কলে ছাঁটা পাঁচ ছটাক চালের পরিবর্তে ঢেঁকি-ছাঁটা অথবা সিদ্ধ চাল চার ছটাক এবং অবশিষ্ট এক ছটাকের পরিবর্তে লাল আটা ২½ ছটাক এবং তৎসহ ফল ২ ছটাক এবং আধছটাক মাংস অথবা একটা ডিম খাওয়া উচিত। চিনি এক ছটাকের পরিবর্তে আধছটাক করা উচিত, কেননা অধিক চিনি খেলে ক্ষুধা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, বরং তার পরিবর্তে অথবা তরকারির তালিকার মধ্যেই আলু অথবা তজ্জাতীয় কিছুর ব্যবস্থা করা উচিত।

এই তরকারি এবং শাক-সবজিগুলি যে জলে সিদ্ধ করা হয় তা' এবং ভাতের ফেন কখনই ফেলে দেওয়া উচিত নয়,

কারণ তাতে খাদ্যের অত্যাবশ্যক অংশ ধাতব লবণগুলিকে শুধু শুধু নষ্ট করা হয়। এইভাবে পরিবর্ত্তিত খাদ্যের তাপ-উৎপাদিকা শক্তি হবে ২৯৬০ ক্যালরি এবং খাদ্য প্রস্তুতের সময়ে শতকরা দশ ভাগ ক্ষতি হবে ধরলেও থাকবে ২৬৬৫ ক্যালরি এবং ক্ষতি বাদ দিলে প্রোটীন হবে ৭৩'৫ গ্রাম, স্নেহ-পদার্থ ৯১'৫ গ্রাম এবং শ্বেতসার ৩৬৫ গ্রাম। প্রস্তাবিত খাদ্যপরিপূরণের জন্য মাসিক ব্যয় ৭৲ টাকার উপরে আরও মোট এক টাকা পড়বে।* তবে ইহা মনে রাখা উচিত যে শিশু ও বালকবালিকার শরীরবৃদ্ধির জন্য এবং সন্তানবতী ও দুগ্ধবতী জননীর পক্ষে আরও বেশী ক্যাল্‌সিয়াম এবং ফস্‌ফরাস সর্ব্বদাই আবশ্যক। তজ্জন্য কিছু অধিক পবিমাণে দুধ অথবা সেই জাতীয় খাদ্য এবং অভাবে ডাই-ক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট খাদ্যের সহিত দেওয়া কর্ত্তব্য।

এইবার আমি সঙ্গতিপন্ন বাঙালীর খাদ্যের দোষ-গুণ বিচার করব, নিম্নে তার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া গেল।

কলে ছাঁটা মিহি চাল	৪ ছটাক
ময়দা	২ ছটাক
দাল	১ ছটাক
মাছ অথবা মাংস	২ ছটাক
দুধ	১০ ছটাক
মাখন বা ঘি	১ ছটাক
তেল	১ ছটাক

* সাত টাকার স্থলে এখন পঁচিশ টাকা এবং পরিপূরকের মূল্য-হিসাবে আরও পাঁচ টাকা বর্ত্তমানে লাগবে।

তরকারি	৩ ছটাক
ফলমূল	২ ছটাক
চিনি	১ ছটাক
মসলা—হলুদ, লঙ্কা, ধনে, সরষে	½ ছটাক
লবণ	প্রয়োজনানুসারে

এই খাদ্য-বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে এতে আছে প্রোটীন ৮৯ গ্রাম, স্নেহ-পদার্থ ১১০ গ্রাম, শ্বেতসার ৩৮৫ গ্রাম এবং ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস্‌ প্রভৃতি ঘটিত ধাতব-লবণ এবং ভাইটামিন গুলিও ('বি১'-ছাড়া) যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই খাদ্যের তাপ-উৎপাদিকা শক্তি ৩৩০১ ক্যালরি। এ হতে এই প্রতীয়মান হয় যে এই খাদ্যে স্নেহ-পদার্থ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে, শ্বেতসার ঠিকই আছে এবং সাধারণ ও প্রাণিদেহজাত প্রোটীনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে আছে। সুতরাং খাদ্যে অত্যধিক স্নেহ-পদার্থ থাকাতে এবং খাদ্যের তাপ-উৎপাদিকা শক্তি সাধারণ প্রয়োজনাপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হওয়াতে শরীরে মেদ-বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক ; ফলে পরিণামে শারীরিক ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী। তা ছাড়া এই খাদ্যে ভাইটামিন 'বি১' অত্যন্ত কম থাকাতে 'বেরিবেরি' প্রভৃতি রোগও হতে পারে, তাতে হৃৎপিণ্ড আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। খাদ্যে চিনির ভাগ বেশী থাকাতে অগ্নিমান্দ্য হওয়া স্বাভাবিক এবং শাক-সবজির একান্ত অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যও হতে পারে। ধনবান্‌ ব্যক্তিরা আবার

অনেকেই অত্যধিক মাছ-মাংস অথবা সন্দেশ-রসগোল্লার পক্ষপাতী, অথচ অর্থোপার্জ্জনের জন্য শারীরিক পরিশ্রম ক'রবার কোন আবশ্যকতা না থাকাতে স্বভাবতঃ অলসভাবে কালাতিপাত করার ফলে মূত্রাশয় অথবা পেন্‌ক্রিয়াস্-এর উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে ; এই কারণে বিত্তশালী ও ভোজন-বিলাসী অলস ব্যক্তিরা নেফ্রাইটিস্, মধুমেহ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। অতএব এক্ষেত্রে আয়ের প্রাচুর্য্য এবং খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য-সত্ত্বেও স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভবপর নয়। দরিদ্রের অসুখ হয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, আবার সম্পদ্‌শালী ব্যক্তির রোগ জন্মে অত্যধিক আহারের চাপে। সুতরাং উপরি-উক্ত খাদ্যকে স্বাস্থ্যকর সুখাদ্যে পরিণত করতে হ'লে নিম্নলিখিত উপায়ে এর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

কলে ছাঁটা মিহি চালের পরিবর্ত্তে ঢেঁকি-ছাঁটা চাল— ৪ ছটাক

সাদা ময়দার পরিবর্ত্তে যাঁতাভাঙ্গা লাল আটা—২ ছটাক

মাখন অথবা ঘি এক ছটাকের পরিবর্ত্তে— ½ ছটাক

তরকারি তিন ছটাকের উপর শাক-সবজি— ২ ছটাক

চিনি এক ছটাকের পরিবর্ত্তে— ½ ছটাক

তরকারি-হিসাবে—আলু, রাঙ্গা আলু, গাজর ও বাঁধাকপিই প্রশস্ত। ফলমূলের মধ্যে আম, পেঁপে, পেয়ারা, বিলাতি বেগুন ও কমলালেবু খুবই উপকারী।

এই পরিবর্ত্তনের ফলে খাদ্যের তাপ-উৎপাদিকা শক্তি ৩৩০০ ক্যালরি হতে নেমে এসে দাঁড়াবে ২৯৮০ ক্যালরিতে এবং

খাদ্য প্রস্তুতাদিতে ১০% ভাগ ক্ষতি বাদ দিয়েও থাকবে ২৬৮২ ক্যালরি। প্রস্তুতের সময়ে ১০ ভাগ ক্ষতি বাদ দিয়ে প্রোটীন থাকবে ৮০ গ্রাম, স্নেহ-পদার্থ ৭৯ গ্রাম এবং শ্বেতসার ৩৫০ গ্রাম। ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ, ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' যেরূপ যথেষ্ট ছিল, তার চেয়েও অধিক থাকবে, অধিকন্তু ঢেঁকি-ছাঁটা চাল ও লাল আটা হতে ভাইটামিন 'বি,' এর অভাবও দূর হবে এবং শাক-সবজি হতে আরো অধিক পরিমাণে ভাইটামিন 'এ' এবং লৌহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ৮০ গ্রাম প্রোটীন ও প্রায় একই পরিমাণ স্নেহ-পদার্থের জন্য মূত্রাশয়ের রোগ অথবা মধুমেহ প্রভৃতি রোগ হতে পারবে না এবং শরীরে মেদও বাড়বার সুযোগ পাবে না; সুতরাং এভাবে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবে না। এই খাদ্য ও তার পরিবর্দ্ধন কিংবা পরিবর্ত্তনের ব্যয়ের কথা ইচ্ছা করেই উল্লেখ ক'রছি না, কেননা সঙ্গতিপন্ন লোকের খাদ্যের ব্যয় কত সে আলোচনা অনাবশ্যক।

এইস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও সঙ্গতিপন্ন বাঙালীর খাদ্য-সম্বন্ধে আমি যে তালিকা দিয়েছি তা আর্থিক অবস্থানুসারে প্রত্যেক বাঙালীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। সঙ্গতিছাড়াও পরিপাকশক্তি, অভ্যাস এবং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে যে খাদ্যের তারতম্য করতে হয়, তা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যে সকল বাঙালী উত্তর ও মধ্যভারতে প্রবাসী তাঁদের অনেকেই একবেলা ভাতের পরিবর্ত্তে আটার রুটি খেয়ে থাকেন, আবার যাঁরা দক্ষিণ

ভারতে আছেন তাঁদের কেউ কেউ হয়ত রাগি অথবা কাম্বু *
প্রভৃতিও খাদ্য-হিসাবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, সুতরাং তাঁদের
খাদ্যে কোন কোন ধাতব-লবণ, যথা—ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস
প্রভৃতি পরিমাণে বেশী থাকবার কথা। এইভাবে যাঁরা পনীর
অথবা ডিম বা মুরগী প্রভৃতি খেতে অভ্যস্ত তাদের খাদ্যে
প্রোটীন, বিশেষতঃ জীবদেহজাত প্রোটীন যথেষ্ট পরিমাণে
থাকে। কিন্তু সেই হেতু আমি যদি ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের
অভাব পূরণের জন্য প্রত্যেক বাঙালীকে রাগি, জোয়ার অথবা
কাম্বু, এবং প্রোটীনের অভাব পরিপূরণের জন্য পনীর,
ভাইটামিন 'এ'র জন্য রেড পাম অয়েল (Red palm oil)
এবং ভাইটামিন 'বি'র জন্য মারমাইট অথবা ঈষ্ট্ খেতে বলি,
তাহলে অনভ্যস্ততার জন্য কিংবা সংগ্রহ করা অসম্ভব ব'লে
তা অনেকেই হয়ত গ্রহণ করতে পারবেন না, এই জন্যই
আমি যতদূর সম্ভব বাঙালীর পরিচিত এবং খাদ্য ব'লে
পরিগণিত বস্তু প্রত্যেকের আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খাদ্যের
পরিপূরক-হিসাবে নির্দ্দেশ করেছি। অভ্যস্ত খাদ্যের
আমূল পরিবর্ত্তন করে নূতন বস্তু গ্রহণ অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু
অভ্যস্ত দ্রব্যের দ্বারা অল্পব্যয়ে একটু এদিক সেদিক ক'রে
অনুপযুক্ত খাদ্যকে উপযোগী ক'রে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে
পারলে সকলেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করতে পারবেন,
এ ভরসাতেই আমি আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। একদিন
সমগ্র ভারতে যে বাঙালী শীর্ষস্থানীয় ছিল, ভাগ্যের নিষ্ঠুর

* চাল অপেক্ষা সুলভ দক্ষিণ-ভারতীয় খাদ্য-শস্য।

পরিহাসে এবং আমাদের নিজের অবিবেচনার ফলে ও কর্ম্মদোষে আজ তারা আবর্ত্তন-চক্রের অনেক নীচে নেমে পড়েছে। বাঙালীর আজ স্বাস্থ্য নাই, প্রতিভা নাই, অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, মানুষের মত বেঁচে থাকবার যা কিছু, তার সব কিছুরই অভাব। অন্ন-সমস্যার মূলে উপার্জ্জন-সমস্যা, তা এখন উৎকট আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বাংলাদেশে কি করে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালীর ধনে ধনবান্ হয়ে দুই চারি খণ্ড রুটি কুকুরের মত আমাদিগকে দিচ্ছে এবং আমরা তা পেয়েই নিশ্চেষ্টভাবে নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র-প্রমুখ মনীষীরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও আমাদের চোখ ফুটাতে পারেন নি, এর চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হ'তে পারে? প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে সমবেত ভ্রাতৃগণ, আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টায় বাঙালীর অন্ন-সমস্যার প্রথম অধ্যায় উপার্জ্জন-সমস্যার সমাধান হউক এবং দ্বিতীয় অধ্যায় খাদ্য-সমস্যারও প্রয়োজনানুরূপ বিহিত হউক, এই একান্ত প্রার্থনা।

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা ক'রে আপনাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি। যা' বলতে চেয়েছি, হয়ত তা যেমন করে বলা উচিত ছিল, বলতে পারি নি, সে বিচার আপনাদের উপর দিয়ে আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য (অভিভাষণ নহে) শেষ ক'রব। বাঙালী মাতৃমন্ত্রের উপাসক। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বৃহত্তর বাংলাদেশে, যেখানে যে বাঙালী আছেন, সকলেই বঙ্গজননীর সন্তান বলে পরিচয়

দিতে গর্ব্ব অনুভব করেন; প্রবাসে একজন বাঙালীকে দেখবামাত্র তাঁর মুখে ফুটে উঠে বঙ্গভাষা! বাঙালী অনেক কিছু হারিয়েছে কিন্তু একটি বস্তু অক্ষয় ও অমর হয়ে আছে, সে তার মাতৃভাষার গৌরব! আজ সেই ভাষা-মাতৃকার পূজার জন্য, আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, আমাদের অনেক কিছু অভাব, অভিযোগ ও সমস্যা নিয়ে। বঙ্গজননীর অঞ্চল ধরে বৃহত্তর বঙ্গের সন্তান আজ প্রতি নিয়ত এই ব'লে কাঁদছে, "কি খাব মা, কি খাব মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে"।

রিক্তা, হৃত-সর্ব্বস্বা বঙ্গজননী, শুধু অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করে বলছেন,—

"বাসী ভাত খাও যাদু, ওই ঢাকা রয়েছে।"

শুধু ভাত, তাও আবার বাসী! সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বলে যাঁর আসন একদিন সকলের উপরে ছিল, আজ তাঁরই সন্তানগণ বুভুক্ষু হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ফিরছে। এ অন্ন-সমস্যার সমাধান আজ বঙ্গসন্তানকে ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে নিজেকেই করতে হবে। বাঙালীকে সুস্থ, সবল, 'ধরমেতে ধীর', 'করমেতে বীর' এবং সংগ্রামে জয়ী হ'তেই হবে। তবেই বাঙালীর মাতৃ-মন্ত্রের উপাসনা সার্থক হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্নজীবী বাঙালীর খাদ্যের স্বল্পব্যয়ে পুষ্টিকারিতা-বর্দ্ধন

নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে লোকে কোন একটা বিশেষ খাদ্যকে নিজস্ব ক'রে নিতে অভ্যস্ত হয়। আবহাওয়া, জমির উৎপাদিকা শক্তি, কোন বিশেষ খাদ্যের সুপ্রাপ্যতা, মাসিক আয়, জীবনযাত্রার মান, পেশা প্রভৃতির বিভেদে কেবল যে ব্যক্তিবিশেষেরই দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার পরিবর্ত্তন হয় এমন নয়, নানাজাতিরও অভ্যস্ত খাদ্যতালিকারও অদল-বদল হয় ঐ সকল অবস্থার তারতম্যে। ভারতবর্ষ এত বড় একটা দেশ যে এক প্রদেশ হতে অন্যপ্রদেশের আবহাওয়া প্রভৃতির অবস্থাও আংশিকভাবে অথবা একেবারেই বিভিন্ন, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের খাদ্যও যে বিভিন্ন হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠানের কিংবা পাঞ্জাবী শিখের খাদ্য মাদ্রাজী অথবা কানাড়ী কিংবা বোম্বের মারাঠী ও গুজরাটীর খাদ্য হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের উত্তরাংশে গমই সাধারণ খাদ্য; আবার বোম্বে, সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ বিহারে গম ও চাল দুইই সাধারণ খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু কাশ্মীর, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে চালই লোকের প্রধান খাদ্য। কাশ্মীর ব্যতীত অন্য তিনটি প্রদেশের লোকেরা সাধারণতঃ বলিষ্ঠকায় নয় এবং অনেকের ধারণা

যে খাদ্যে ভাতের প্রাচুর্য্যের জন্যই তাদের এই দুরবস্থা। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ম্যাক্‌ক্যারিসনের মতও তাই। তাঁর মতে পুষ্টিহিসাবে বাঙালী ও মাদ্রাজীদের খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং পক্ষান্তরে শিখ ও পাঠানদের খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বলকারক (চিত্র ১, ২৯ পৃষ্ঠা)। তাই অনেকেই ঐ সকল প্রদেশবাসীদের পরামর্শ দেন যে, তাঁরা যেন ভাতের বদলে আটা বা অন্যান্য গমজাত খাদ্য খান, তাহলেই তাঁদের শরীর ভারতের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের মত সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠবে। কথাটা বলা যত সহজ, তাকে কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। উত্তর মেরুর অধিবাসী এস্কিমোরা শুধু মাংস খেয়েই বেঁচে থাকে ; তাদের পক্ষে নিরামিষাশী হয়ে শাকপাতা খেয়ে বেঁচে থাকা যেমন দুর্ঘট, একজন বাঙালী বা মাদ্রাজীর পক্ষে তেমনি ভাত ছেড়ে দিয়ে কেবল ছাতু বা গম খেয়ে জীবনধারণ করা তেমনি বিড়ম্বনা।

সাধারণতঃ যে সকল প্রদেশে প্রচুর (বৎসরে চল্লিশ ইঞ্চি বা ততোধিক) পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় তত্রত্য পাললিক জমিতে ধানের চাষ ভাল হয়। সমগ্র বাংলাদেশ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, আসামের সুরমা উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সমগ্র উড়িষ্যা, বিহারের সাঁওতাল পরগণা ও ত্রিহুত বিভাগ, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর এবং বিলাসপুর, পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকা, যুক্ত-প্রদেশের দেরাদূন, গোরখপুর এবং বেনারস অঞ্চল, দক্ষিণ ভারতের মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন রাজ্য এবং সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার আবহাওয়া ও জমির অবস্থা ধানচাষের

উপযুক্ত (চিত্র, ৪) ; তাছাড়া হিমালয়ের পাদদেশে সমগ্র তরাই অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশের সাজাহানপুরে এবং পাঞ্জাবের গুরুদাস-

চিত্র, ৪
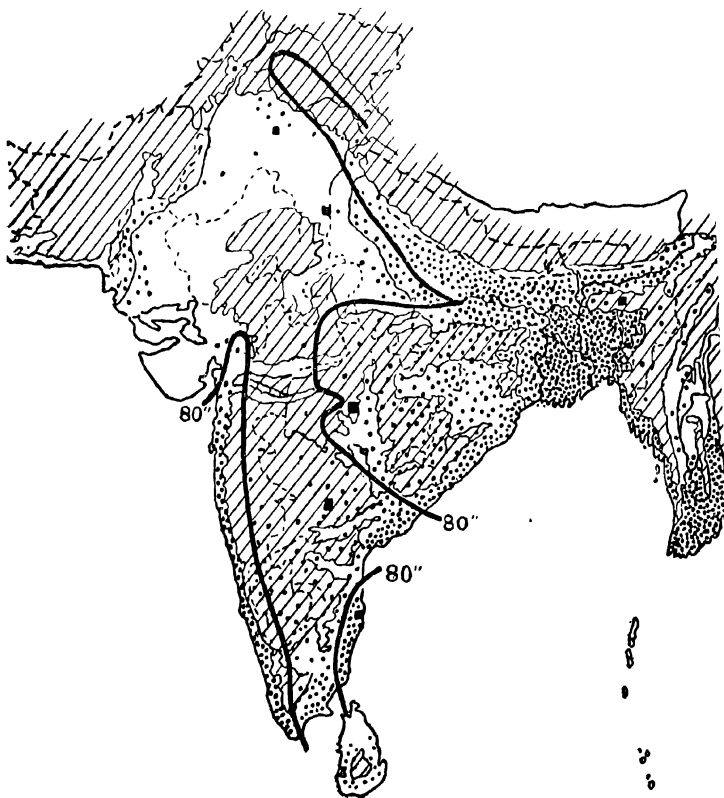
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ধান্যের চাষভূমি

(ঘন-সন্নিবিষ্ট পুঞ্জীভূত বিন্দু ধান্য-ফসলের পরিমাণ-জ্ঞাপক এবং গভীর বক্ররেখাগুলি বৎসরে চল্লিশ ইঞ্চি পরিমিত বারিবর্ষণের অঞ্চলের সীমানা-নির্দ্দেশক)

পুরেও খাল কেটে জলসেচের দ্বারা জমিকে ধানচাষের উপযুক্ত করে নেওয়াতে কিছু কিছু ধানের চাষ হয়। সুতরাং সমগ্র বাংলাদেশ, মাদ্রাজ, আসাম, উড়িষ্যা ও কাশ্মীর, বিহারের অর্দ্ধেকের বেশী অংশ, মধ্যপ্রদেশের মহাকোশল এবং যুক্তপ্রদেশ ও বোম্বের কোন কোন অঞ্চলে ভাতই যে প্রধান খাদ্য ব'লে গণ্য হয় তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নেই। আবার বোম্বে প্রেসিডেন্সী, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু ও বিহারে পাশাপাশি ধান ও গমের চাষ সম্ভবপর ব'লে ঐ সকল প্রদেশের অধিবাসীরা কেবল ভাত অথবা কেবল রুটি না খেয়ে একসঙ্গে দুইই খেতে অভ্যস্ত এবং তার ফলে শুধু ভাত অথবা শুধু রুটির খাদ্যপুষ্টি-হিসাবে যে সকল অভাব আছে, ভাত ও রুটি এই উভয় মিশ্রিত খাদ্যে ঐ অভাব পরিপূরণ হয় ব'লে তত্রত্য অধিবাসীরা সাধারণতঃ বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হয়, এবং দৈহিক শক্তি ও কর্ম্মঠতা-হিসাবে তারা অন্নজীবী বাঙালী, মাদ্রাজী, আসামী অথবা উড়িয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পশ্চিম পাঞ্জাবে কেবল গমেরই চাষ সম্ভবপর এবং ঐ উদ্দেশ্যে অধিবাসীদের যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তার জন্য, কতকটা আবহাওয়ার শ্রেষ্ঠতার জন্য এবং দাল, রুটি ও মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের জন্যও পাঞ্জাবী এবং পাঠানেরা অত্যধিক বলশালী এবং বীর্য্যবান্ ব'লে পরিচিত। ভারতবর্ষের নিম্নপ্রদেশগুলিতে অন্যান্য প্রদেশ হ'তে আনীত গম, আটা কিংবা ময়দা বেশীদিন ভাল থাকে না; ছাতা

পড়ে কিংবা ডেলা পাকিয়ে এগুলি অতি সহজেই খাদ্যের অযোগ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরা পুষ্টিকরই হউক কিংবা পুষ্টিহীনই হউক, সহজলভ্য ভাত খেয়েই যে জীবনধারণ করবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বোধ হয় দৈহিক শক্তির অভাব-পরিপূরণের জন্যই ভগবান্ এসকল জাতিকে উর্ব্বর মস্তিষ্কের সম্পদে সম্পদ্‌শালী করে গড়েছেন। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় বাঙালী, মাদ্রাজী এবং কাশ্মীরীরা যে ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণীকৃত হয়েছে।

যে সকল প্রদেশে ভাতই প্রধান খাদ্য, তাদের বিত্তহীন জনসাধারণ যে খাদ্য খায় তাতে পরিপুষ্টির যে নিতান্তই অভাব, এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই। এদেশে বহু গবেষক ও বিজ্ঞানী নানা প্রদেশের লোকের খাদ্য-তালিকাগুলিকে তুলনামূলক ভাবে বিচার এবং বিশ্লেষণ ক'রে এবং তার সঙ্গে তাদের দৈহিক শক্তিহীনতা ও অক্ষমতাও লক্ষ্য ক'রে ঐ খাদ্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে জনসাধারণকে সে সম্বন্ধে অবহিত ক'রবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করেছেন। এরূপ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের নির্দ্দেশিত তালিকা তুলনার জন্য নিম্নে দেওয়া গেল। একটু বিচার ও লক্ষ্য ক'রে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে নামে বিভিন্ন হলেও, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশ-সম্বন্ধীয় তালিকার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান, সুতরাং তাদের পার্থক্য মোটেই প্রকারগত নয়, কেবল পরিমাণগুলির উনিশ-বিশ মাত্র।

১। **ম্যাক্‌ক্যারিসন***-বর্ণিত মাদ্রাজের দরিদ্র হিন্দুর দৈনন্দিন খাদ্য (১৯৩১) :—

কলে ছাঁটা চাল	২১ আউন্স
কলাই দাল	০·৭ ,,
অন্যান্য দাল	০·৭ ,,
উদ্ভিজ্জ তেল (তিল তেল)	০·১ ,,
তরকারি ও শাক-সবজি	২ ,,
মাছ কিংবা মাংস	০·০৬ ,,
নারিকেল	০·০৫ ,,

এর ক্যালরি-মূল্য ২৩২৫, প্রোটীন—৪২·৯২, স্নেহ-উপাদান—৭·১৮, শর্করা—৫২০·২৯। ম্যাক্‌ক্যারিসনের মতে এই খাদ্যে যে অত্যল্প প্রোটীন আছে তার প্রায় সবটাই উদ্ভিজ্জ প্রোটীন ; স্নেহপদার্থও অত্যন্ত কম, শ্বেতসারের খুবই আধিক্য এবং ক্যালরি-মূল্যও যথেষ্ট নয়। এতে ভাইটামিন 'এ' ও 'বি,'ও অত্যন্ত কম, এবং ক্যাল্‌সিয়াম্, ফস্‌ফরাস ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব-লবণেরও অভাব সুস্পষ্ট।

২। **এক্রয়েড**†-বর্ণিত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসীর দৈনন্দিন খাদ্য (১৯৩৭) :—

কলে ছাঁটা চাল	১৫ আউন্স
দুধ	১ ,,
দাল	১ ,,

* স্যর রবার্ট ম্যাক্‌ক্যারিসন।

† কুনুর পুষ্টি-গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডব্লিউ. আর. এক্রয়েড।

তরিতরকারি	১·৫ আউন্স
শাক প্রভৃতি	০·২৫ ”
তেল প্রভৃতি স্নেহ-উপাদান	০·৫ ”

এর ক্যালরি-মূল্য ১৭৫০। এতে আছে প্রোটীন ৩৮ গ্রাম, স্নেহ-উপাদান ১৯ গ্রাম, শ্বেতসার ৩৫৭ গ্রাম, ক্যাল্‌সিয়াম ০·১৬ গ্রাম, ফস্‌ফরাস ০·৬ গ্রাম, লৌহ ৯ মিলিগ্রাম, ভাইটামিন ‘এ’ ৫০০ ইউনিট, ‘বি,’ ১৬০ ইউনিট এবং ‘সি’ ১৫ মিলিগ্রাম।

৩। ১৯৩৮ সালে একটি প্রবন্ধে আমি একটি খাদ্য-তালিকা প্রকাশ করি। উহা মোটামুটিভাবে বাংলাদেশ, আসাম, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের দরিদ্র-জনসাধারণের দৈনন্দিন খাদ্যের পরিচায়ক।

কলে ছাঁটা চাল	১০ ছটাক	(২০ আউন্স)
দাল	১ ”	(২ ”)
মাছ বা মাংস	½ ”	(১ ”)
উদ্ভিজ্জ তেল	½ ”	(১ ”)
শিকড়-জাতীয় তরকারি	¾ ”	(১½ ”)
শাক-পাতা	½ ”	(১ ”)
দুধ	১ ”	(২ ”)
মস্‌লা	½ ”	(১ ”)
চিনি বা গুড়	½ ”	(১ ”)

এর ক্যালরি-মূল্য ২৫২৭ এবং এতে প্রোটীন আছে ৬৫ গ্রাম (অধিকাংশ উদ্ভিজ্জ), স্নেহ-উপাদান ৩২ গ্রাম, শ্বেতসার

৪১৫ গ্রাম, ক্যাল্‌সিয়াম ০·২৫ গ্রাম, ফস্‌ফরাস ০·৮৫ গ্রাম, লৌহ ১৮ মিলিগ্রাম, ভাইটামিন 'এ' ৭৫০ ইউনিট, ভাইটামিন 'বি' ২০০ ইউনিট এবং ভাইটামিন 'সি' ১৫ মিলিগ্রাম মাত্র।

সুতরাং এই খাদ্য শুধু গুণানুসারে নয়, পরিমাণেও অপর্য্যাপ্ত। প্রতিদিনের অত্যাবশ্যক ক্যালরি যেমন এতে নেই, তেমনি আবার প্রোটীনের পরিমাণও কম এবং অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ বলে গুণেও নিকৃষ্ট, স্নেহ-উপাদানও অত্যন্ত কম, শ্বেতসার-জাতীয় উপাদান প্রয়োজনের অনুপাতে অত্যধিক আছে। এতে ধাতব লবণ বিশেষতঃ ক্যাল্‌সিয়ামের পরিমাণও খুবই কম এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'বি,'-রও অত্যন্ত অভাব।

৪। চাটার্জ্জি*-বর্ণিত (১৯৩৮) কলিকাতার স্কুল ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসগুলির দৈনন্দিন খাদ্যে—ক্যালরির পরিমাণ ২২০০—২৪০০, প্রোটীন ৬০—৭০ গ্রাম, স্নেহ-উপাদান ৫০—৬০ গ্রাম, শ্বেতসার ৪০০—৪২৫ গ্রাম, লৌহ ৬·৫৬—৭·৯৭ মিলিগ্রাম, ক্যাল্‌সিয়াম ০·৬—১·২ গ্রাম এবং ফস্‌ফরাস ১—১·৩ গ্রাম।

তৃতীয় এবং চতুর্থ তালিকা প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন লোকের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে রচিত হ'লেও এদের বিভিন্ন উপাদানের প্রকারগত এবং পরিমাণগত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীর-বিদ্যার অধ্যাপক ম্যাক্‌কে বলেন, অন্নজীবী ভারতীয়দের স্বাস্থ্য ও শরীরের বাঁধন একসঙ্গে গম ও দুধ খায় যে সকল

* ডাক্তার এ. এন. চাটার্জ্জি।

লোক তাদের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট এবং তার কারণ চালের মধ্যে প্রোটীনের অভাব। ১৯৩৭ সালে অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব হাইজিনের অধ্যাপক উইল্‌সন ও তৎসহযোগীরা কলিকাতার কোনও অঞ্চলের লোকের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার বিশ্লেষণ ও বিচার করে একই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষের খাদ্যতালিকায় প্রোটীনের অভাব অত্যন্ত অধিক এবং এই অভাব পরিপূরণ করা খুবই কঠিন। ঐ একই সময়ে কুনূরে এক্রয়েড ও কৃষ্ণান, ইঁদুরের এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপর গবেষণাক্রমে দক্ষিণ-ভারতীয় দরিদ্র জনসাধারণের খাদ্যের সঙ্গে সোয়াবীন মিশিয়ে ঐ খাদ্যের পরিপুষ্টিশক্তি কতটা বাড়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পান যে, তাতে বিশেষ কোন উপকারই হয় না, কিন্তু একই খাদ্যের সঙ্গে ডিম মিশিয়ে দিলে তার পুষ্টিকারিতা অনেকটা বেড়ে যায়। সুতরাং সোয়াবীনে যথেষ্ট প্রোটীন, স্নেহ-পদার্থ, ফস্‌ফরাস, লৌহ এবং কোন কোন ভাইটামিন থাকা সত্ত্বেও পুষ্টিকর খাদ্য-হিসাবে ডিম তার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান্। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ডক্টর বি. সি. গুহ বাংলাদেশের শহরের বিশেষতঃ মেস ও ছাত্রাবাসগুলির বাসিন্দাদের স্বাভাবিক খাদ্যের সঙ্গে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র প্রাচুর্য্যের জন্য কড্‌লিভার তেল এবং ভাইটামিন 'বি-সমষ্টির' আধার-রূপে ঈষ্ট্‌কে পরিপূরক-হিসাবে খেতে দিয়ে দেখতে পান যে, যে সকল ইঁদুর ঐ পরিপূরকগুলি খেতে পায়, তারা অন্যগুলির চেয়ে ওজনে অনেক বেশী বাড়ে।

খাদ্যে প্রোটীন ও ধাতব লবণগুলি বাড়ালে তাদের ওজন আরও বাড়তে থাকে দেখে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে বাঙালীর খাদ্যে শুধু যে ভাইটামিন গুলিই কম আছে এমন নয়, তাতে প্রোটীন ও ধাতব লবণেরও খুবই অভাব। ১৯৩৬ সালে দিল্লীতে সুরীও গবেষণাক্রমে দেখতে পান যে ভারতীয় জনসাধারণের খাদ্যে ভাইটামিন 'এ' মোটেই পর্য্যাপ্ত নয় এবং রান্নার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যে সকল খাদ্যে এই ভাইটামিন প্রয়োজনের অনুপাতে অতি সামান্যই থাকে, তা যখন খোলা হাঁড়িতে বহুক্ষণ ধরে বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে সিদ্ধ করা হয়, তখন তাতে আর ঐ ভাইটামিনের বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অতঃপর এক্রয়েড এবং তৎসহযোগী সিদ্ধান্ত করেন যে, দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের খাদ্যে ক্যাল্সিয়াম প্রভৃতি ধাতব-লবণ এবং 'বি-সমষ্টি'-জাতীয় ভাইটামিনেরও একান্ত অভাব, কারণ ঐ প্রকারের খাদ্যগ্রহণরত ইঁদুরগুলিকে খাদ্যের পরিপূরকরূপে ঈষ্ট্, ক্যাল্সিয়াম ল্যাক্টেট অথবা মাখন-তোলা শুকনো দুধের গুঁড়ো খেতে দিলে তাদের স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হয় এবং তারা ওজনেও অনেকটা বাড়ে, কিন্তু পুষ্টিকর ছানার (কেজিন) অথবা এমাইনো এসিড সিষ্টিন প্রভৃতির ঐ খাদ্যের পুষ্টিশক্তির পরিপূরক-হিসাবে বিশেষ কোন মূল্যই নেই। সুতরাং তাঁদের মতে ম্যাক্কে কিংবা উইলসনের ধারণা খুব সম্ভবতঃ ভুল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কতকগুলি মেস ও ছাত্রাবাসের সাধারণ খাদ্যে ধাতব-লবণের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ঐ

প্রকারের খাদ্য বিশ্লেষণক্রমে ডক্টর গুহ ও কে. এল. রায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন :—

(১) ঐরূপ খাদ্যে পরিশোষণীয় লৌহের পরিমাণ প্রতিদিন মাথাপিছু ৬·৫৬—৭·৯৭ মিলিগ্রাম মাত্র। ১০ মিলিগ্রাম পরিমিত লৌহকে প্রয়োজনীয় পরিমাণের আদর্শ ধরে নিলে, এতে দেহের প্রয়োজন কিছুতেই মিটতে পারে না।

(২) এ খাদ্যে মাথাপিছু প্রতিদিন গৃহীত ক্যাল্সিয়ামের পরিমাণ ০·৬-১·২ গ্রাম, তাও প্রয়োজনানুপাতে অপর্য্যাপ্ত; কারণ প্রতিদিন ন্যূনকল্পে ১ গ্রাম না হ'লে কিছুতেই চলে না।

(৩) প্রতিদিন মাথাপিছু ১—১·৩ গ্রাম ফস্ফরাস আবশ্যক, সুতরাং এই খাদ্যের ০·৯—১·১ গ্রাম ফস্ফরাস পর্য্যাপ্ত বলেই মনে হয়। তবু বিভিন্ন সময়ে ম্যাক্ক্যারিসন ও তৎসহযোগী নরিস এবং রঙ্গনাথন প্রভৃতির মতে খাদ্যগুলিকে বারবার ধুয়ে রান্না করার ফলে তাদের অনেকটা ফস্ফরাস ও প্রোটীনজাতীয় উপাদান বাইরে চলে যায়। সুতরাং ফস্ফরাসের পরিমাণ দৃশ্যতঃ ঠিকই আছে মনে হ'লেও উল্লিখিত কারণে কতকটা নষ্ট হওয়ার জন্য এবং কতকটা দুষ্পরিশোষ্য ফাইটিন-ফস্ফেটরূপে শস্যগুলিতে বর্ত্তমান থাকে ব'লেও, সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যাল্সিয়ামের অভাবে দেহবৃদ্ধির জন্য কখনই তা পর্য্যাপ্ত হতে পারে না।

সুতরাং দৈনন্দিন অন্নময় খাদ্যের দোষ-গুণ-সম্বন্ধে

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই একমত যে, তাতে কতকটা প্রোটীনের এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'বি,'র অত্যন্ত অভাব ছাড়াও ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ধাতব লবণগুলিরও অভাব। বাঙালীর খাদ্য-তালিকার উপাদানগুলির মধ্যে ভাত, দাল, নানাপ্রকারেব তরকারি, সরষের তেল, মাংস ও চিনি প্রভৃতিতে ক্যাল্‌সিয়ামের পরিমাণ অতি অল্পই থাকে এবং ভাত, ময়দা, নানা তরকারি, সরষের তেল এবং চিনিতে ফস্‌ফরাসও পরিমাণে খুবই কম। ঐ সকল ত্রুটি সংশোধনের জন্য কলে ছাঁটা পরিষ্কার চাল, অড়হর ও কলাই দাল, বেগুন, কাঁচকলা, নটেশাক, নারিকেল এবং অল্প মাংস-সমন্বিত ভারতীয় জনসাধারণের খাদ্যের সঙ্গে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথবা একই সঙ্গে ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস ও অঙ্কুরিত দাল যোগ করে ইঁদুর-দেহে যে ফলাফল আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, নিম্নে সেগুলি সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

(১) অন্নময় ভারতীয় খাদ্যের সঙ্গে ক্যাল্‌সিয়াম-সংযোগে দেহের বৃদ্ধি অধিকতর হয়; তৎসহ অল্প ফস্‌ফরাসের সংযোগ ঘটলে ক্যাল্‌সিয়ামের উপকারিতা আরও একটু বাড়ে, কিন্তু কেবল ফস্‌ফরাস-সংযোগে কোন ফলই দেখা যায় না। (চিত্র, ২)।

(২) অঙ্কুরিত ছোলা অথবা একই সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা ও ক্যাল্‌সিয়ামের সংযোগে খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বহুলাংশে বেড়ে যায়।

সুতরাং বাঙালীর স্বাস্থ্য রক্ষা করতে এবং দেহকে সুগঠিত ও শক্তিশালী ক'রে তুলতে হ'লে অন্নজীবী লক্ষ লক্ষ লোকের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার ত্রুটি-সমূহের সংশোধনের জন্য কতকটা অদল-বদল অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, চালের পুষ্টিকারিতা কম ব'লে তাকে খাদ্যতালিকা হতে ঠেলে দিয়ে তার স্থানে অন্য কোন পুষ্টিকর শস্য বসানো উচিত কি ? ইহার একমাত্র উত্তর, "না, কখনই নয়।"

তার কারণ এ প্রবন্ধের মুখবন্ধেই বলা হয়েছে। তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে। অধুনা কতকগুলি নূতন গবেষণার ফলে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, চালের প্রোটীন গম কিংবা অন্যান্য শস্যের প্রোটীনের চেয়ে দেহক্ষয়-পূরণে অনেক বেশী মূল্যবান্। আটা, সুজি প্রভৃতি গমজাত উপাদানগুলিতে যদিও প্রোটীনের পরিমাণ চালের প্রোটীনের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা প্রায় তিন ভাগ বেশী, তবু প্রায়শঃ দেখা যায় যে অন্নজীবীরা সাধারণতঃ প্রত্যহ যতটুকু ওজনের চালের ভাত খায়, রুটি খায় যারা তারা তার চেয়ে কম ওজনের আটা খেয়েই তৃপ্তিলাভ করে। সুতরাং শতকরা তিনভাগ প্রোটীনের ন্যূনতা অধিক পরিমাণ চালের ভাত হতে সহজেই দূর হয়। তাছাড়া আর একটা সুবিধা আছে ; চালকে হাঁড়িতে জলের মধ্যে ফেলে ফুটিয়ে নিলেই স্বল্পায়াসে ও সহজেই ভাত প্রস্তুত হয়, কিন্তু আটার রুটি কিংবা পুরী অথবা ময়দার লুচি খেতে হ'লে তার জন্য পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশী এবং সময়ও

দিতে হয় অনেকটা। সুতরাং ভাতকে একেবারে অপাংক্তেয় না ক'রে তার খানিকটা অংশের বদলে অন্য কোন পুষ্টিকর এবং উপাদেয় শস্যকে খাদ্যতালিকায় স্থান দেওয়াই সমীচীন। ম্যাক্‌ক্যারিসন এইজন্য উত্তর-ভারতীয়দের জন্য কতকটা আটার এবং এক্রয়েড ও কৃষ্ণান দক্ষিণ-ভারতীয়দের জন্য 'রাগি' শস্য গ্রহণেব নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন। উত্তর ভারতে বিশেষতঃ বাংলাদেশে রাগি একেবারে অচল, কারণ দক্ষিণ-ভারতেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার তেমন প্রচলন নেই ব'লে রাগিকে একমাত্র কারাগারের খাদ্যতালিকাতেই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতি গমজাত দ্রব্য এবং আলু, রাঙাআলু প্রভৃতি মূল-জাতীয় তরকারিই ভাতের পরিপূরক হিসাবে প্রকৃষ্ট। তাতে শুধু যে ভাতের একঘেয়েত্বই নষ্ট হবে এমন নয় বরং যারা বহুক্ষণ ব্যবধানে খাদ্য-গ্রহণ করে ভাতের চেয়ে গম বা গমজাত খাদ্য সম্পূর্ণ পরিপাক হতে অধিক সময় লাগে ব'লে একবার খাদ্য-গ্রহণের পর অপেক্ষাকৃত অধিককাল তাদের পুনরায় খাদ্য-গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। যারা সারাদিন পরিশ্রম করে অথবা দিনে ঘড়ির কাঁটা ধরে যাদের বারবার খাওয়ার মত সঙ্গতি নেই, এরূপ জনসাধারণের পক্ষে গম ও চালের সমন্বয়ে গঠিত খাদ্যই সমধিক উপযোগী। গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী ও যুক্তপ্রদেশের অধিবাসীরা কি কারণে এরূপ মিশ্র খাদ্য খেতে অভ্যস্ত তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং ঐ সকল প্রদেশের দরিদ্র-জনসাধারণ সর্ব্বদাই দরিদ্র বাঙালীর চেয়ে অধিকতর

পুষ্টিকর এবং তৃপ্তিদায়ক খাদ্য খায় ব'লে তাদের শারীরিক শক্তি ও কার্য্যক্ষমতাও তুলনায় বেশী।

বাঙালীর সাধারণ খাদ্যে যে সকল ত্রুটি ও উপাদানের অভাব আছে, কোন একটি বিশেষ খাদ্যের দ্বারা সেগুলির পরিপূরণ করতে হ'লে একমাত্র দুধের দ্বারাই তা সম্ভবপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সিন্ধুদেশ এবং পশ্চিম-পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দুধের একান্ত অভাব। বিশেষতঃ বাংলাদেশে কেবল দুগ্ধপায়ী শিশু, গর্ভিনী, প্রসূতি এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্যই যেটুকু দুধের আবশ্যক, তাও নেই। এজন্যই জনসাধারণের পক্ষে দুধ-পান করা অসম্ভব। সুতরাং দুধের পরিবর্ত্তে অন্য কোন উপযুক্ত খাদ্যের সন্ধান অবশ্য-কর্ত্তব্য। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এক্রয়েড ও কৃষ্ণান চালের পরিপূরক-হিসাবে শুখনো দুধের গুঁড়োর ব্যবস্থা করতে বলেন, কারণ এতে দুধের প্রোটীনগুলি, ল্যাক্‌টোজ, ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস প্রভৃতি উপাদানগুলি অব্যাহত থাকে। পরিপুষ্টি-সম্বন্ধে এর উপকারিতা-বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না, কিন্তু অসুবিধা এই যে এটি নিউজিল্যাণ্ড বা আমেরিকা হ'তে আনীত বিদেশী পণ্য, সুতরাং ইচ্ছামত যখন-তখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া সম্ভবপর নয়। শুধু তাই নয়, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আসে বলে খাঁটি দুধের তুলনায় বিক্রয়-মূল্য কতকটা কম হ'লেও উহা যে মূল্যে বিক্রয় হয় তাতে জনসাধারণের পক্ষে দৈনন্দিন খাদ্য-হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ চীন-দেশীয় খাদ্য সোয়াবীনের উল্লেখ

করেন। অত্যাবশ্যক উপাদানগুলির পরিমাণ-হিসাবে এ দাল যে খুবই পুষ্টিকর একটি খাদ্যোপাদান, তা' স্বীকার্য্য, কারণ এতে প্রোটীন আছে শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ, স্নেহপদার্থ আছে ১৯·৫ ভাগ, ফস্‌ফরাস ০·৬৮৯ ভাগ এবং লৌহ শতকরা ১১·৫ মিলিগ্রাম এবং চৈনিক বিজ্ঞানী ওয়ানের মতে এর ভাইটামিন 'বি$_১$'এর পরিমাণ শুখনো দুধের গুঁড়োর তিনগুণ এবং ভাইটামিন 'বি$_২$'ও প্রায় তিন-ভাগের দুভাগ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কতকগুলি অসুবিধার জন্য পরিপূরক-হিসাবে এর বহুল প্রচলন এদেশে সম্ভবপর নয়, কারণ, (১) এদেশে সোয়াবীন খুব বেশী জন্মায় না এবং বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়াতে কোন দাল-জাতীয় উপাদানই বেশী জন্মানো সম্ভবপরও নয়; (২) এদেশের লোকেরা সোয়াবীন খেতে মোটেই অভ্যস্ত নয়, কারণ দালরূপে এটা এত বিস্বাদ যে তা' খাওয়া চলে না; (৩) সোয়াবীন হতে দুধের মত এবং অন্যান্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত করে চীন বা ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের লোকে খায়, এদেশের লোকেরা সেগুলি ঠিকভাবে প্রস্তুত করতে জানে না এবং জানলেও তা' বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ; (৪) প্রোটীনের আধিক্যের উপর যতটা জোর দেওয়া হয়, ততটা জোর দেওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ দেহক্ষয়ের পরিপূরকরূপে সোয়াবীন-প্রোটীনের মূল্য এদেশীয় দালগুলির (অড়হর, ছোলা, কলাই প্রভৃতি) চেয়ে অনেক কম; (৫) 'বি'-জাতীয় ভাইটামিনগুলি আমাদের দেশীয় দালগুলিতেও

অঙ্কুরিত অবস্থায় প্রচুর পাওয়া যায় এবং সেগুলিতে সোয়াবীনের তুলনায় উদ্ভিজ্জ স্নেহ-উপাদানের অভাব এদেশীয় নারিকেল, চীনা বাদাম প্রভৃতির দ্বারাই পূরণ হতে পারে। সুতরাং এই কারণে অন্নময়-খাদ্যের পরিপূরক-হিসাবে সোয়াবীনের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া চলে না।

১৯৩৭ সালে এক্রেয়েড ও কৃষ্ণান প্রাত্যহিক খাদ্যের সঙ্গে অল্প-পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট গ্রহণের নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু 'বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের বাঙালীর খাদ্যের ত্রুটি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধে লেখক-বর্ণিত গবেষণা পরীক্ষায় (৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে দেহবৃদ্ধির জন্য পরিপূবক-হিসাবে একসঙ্গে ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট এবং ক্ষারধর্ম্মী পটাসিয়াম ফস্‌ফেট, অথবা কেবল ডাইক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট খেতে দিলে শুধু ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট অপেক্ষা অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ তাতে অস্থিবৃদ্ধির জন্য ঠিক যে অনুপাতে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফেট আবশ্যক তা' সহজলভ্য হয়। যদিও এই পরীক্ষায় দক্ষিণ-ভারতীয় খাদ্য ব্যবহৃত হয়েছিল, তা'হলেও বাঙালীর অথবা অন্যান্য প্রদেশের একই প্রকার অন্নময় খাদ্য সম্বন্ধেও সিদ্ধান্তগুলি প্রযোজ্য ; কেন না, একজন দরিদ্র বাঙালীর খাদ্যের সঙ্গে একজন মাদ্রাজীর খাদ্যের তফাৎ এই যে, বাঙালী নারিকেল তেল কিংবা তিল তেলের পরিবর্ত্তে সরষের তেল খায় এবং বাঙালীর খাদ্যে তেঁতুল ও লঙ্কার পরিমাণ মাদ্রাজীর খাদ্যের তুলনায় খুবই কম।

ইঁদুর-দেহে গবেষণার ফল মানুষের বেলা কতটা প্রযোজ্য তাও বিচার্য্য। খাদ্য-গ্রহণ সম্বন্ধে মানুষ সর্ব্বাংশে ইঁদুরের তুল্য। ইঁদুর একাধারে মাংসাশী ও নিরামিষভোজী অর্থাৎ সর্ব্বভুক্; মানুষও তাই। পৃথিবীতে এমন কোন খাদ্য নেই যা' মানুষ কোন না কোন অবস্থায় খায়নি, বা খেতে পারে না। সুতরাং ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে কোন খাদ্যের যে গুণাগুণ প্রমাণিত হয়েছে, মানুষ সম্বন্ধে সেগুলি অনেকটা খাটে এবং ইঁদুর-পরীক্ষায় লব্ধ ফলগুলি মানুষেব দেহেও যে একইভাবে পাওয়া যেতে পারে এ সম্বন্ধে পুষ্টিবিদ্‌গণ সকলেই একমত।

সুতরাং আমার মতে শিশুদের দেহবৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন কুড়ি গ্রেন করে ডাইক্যাল্‌সিয়াম ফস্‌ফেট দিলে মাসে গড়পড়তা খরচ পড়ে আট আনা হতে দেড়টাকা মাত্র। এতে শুধু ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের অভাবই যে দূর হবে তা' নয়, সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত প্রোটীনেরও অন্ত্রগুলিতে পরিশোষণ অধিক পরিমাণে হবে এবং ফলে শিশুদের উপগলগ্রন্থির স্বাভাবিকতা রক্ষা হবে ব'লে খিট্‌খিটে মেজাজ, অকারণে বায়না করা কি কান্না প্রভৃতিও কমে যাবে। বাঙ্গালোরে শ্রীনিবাসন ১৯৩৮ সালে দেখিয়েছেন যে মোটা ও লাল সিদ্ধ চালে প্রোটীন, ক্যাল্‌-সিয়াম, ফস্‌ফরাস ও ভাইটামিন 'বি,' কলেছাঁটা পরিষ্কার চালের চেয়ে অধিক পরিমাণে থাকে। সুতরাং খাদ্য-হিসাবে মোটা ও লাল সিদ্ধ চালই প্রশস্ত; এতে পরিষ্কার মিহি আতপ চালের চেয়ে খরচও কম। গরম ভাতের পরিবর্ত্তে

সময়ে সময়ে পান্তাভাত খাওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। প্রোটীনের অভাব দূর ক'রবার জন্য মাছ কি মাংসের পরিমাণ বাড়াতে পারলেই সব চেয়ে ভাল হয়। যদি দুর্ম্মূল্যতা, দুষ্প্রাপ্যতা কিংবা অন্য কারণে তা সম্ভবপর না হয় তবে প্রতিদিন প্রাতে ছটাকখানেক অঙ্কুরিত মুগ, ছোলা কি কলাই, অল্প নারিকেল ও গুড়ের সঙ্গে খেলে বিশেষ উপকার হবে; কারণ তাতে প্রোটীন, কতকটা স্নেহ-উপাদান এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া হবে। এর খরচও মাসে দেড়টাকার বেশী পড়বে না। খাদ্যের সঙ্গে দৈনিক সিকি ছটাক হতে আধ ছটাক পবিমিত ঈষ্ট্ খেলেও একই সঙ্গে প্রোটীন ও 'বি'-জাতীয় ভাইটামিনের অভাব মিটতে পারে, তার জন্য খরচ মাসে এক টাকার অধিক হবে না। নটেশাক, পালংশাক প্রভৃতি শাক-পাতাতে যথেষ্ট পরিমাণে 'কেরোটিন' নামক উপাদান আছে। এই কেরোটিনই যকৃতের সাহায্যে ভাইটামিন 'এ'তে রূপান্তরিত হয়। ঘি, মাখন, কড্লিভার অয়েল প্রভৃতি বহুমূল্য উপাদান; সুতরাং ভাইটামিন 'এ'র জন্য এগুলি খাওয়া জনসাধারণের পক্ষে সাধ্যাতীত। এজন্য অতি অল্প খরচে শাকপাতার 'কেরোটিন' হ'তে দেহের এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক ভাইটামিন 'এ' নিজের শরীরেই প্রস্তুত করে নেওয়ার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ সকল শাকপাতা হ'তে একই সঙ্গে যে লৌহ-ঘটিত লবণ পাওয়া যাবে, তাতেই বাঙালীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় লৌহের

অভাবও মিটবে। ভাইটামিন 'ডি'র জন্য এদেশে কারো মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, কারণ সকালবেলার রোদে একটু ঘুরা ফিরা করলে প্রাতঃসূর্য্যের বেগুনেতর রশ্মিই দেহের চামড়ার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অথচ বিনা-খরচায় ভাইটামিন 'ডি' তৈয়ারি ক'রবার ভার নেবে। আশা করি এ সকল নির্দ্দেশ পালন করলে অতি অল্প ব্যয়ে এবং কতকটা অনায়াসে বাঙালীর এবং অন্যান্য অন্নভুক্-জাতির খাদ্যের ত্রুটিগুলির বহুলাংশে পরিপূরণ হতে পারবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঙালীর খাদ্যে দালের স্থান

বাঙালীর খাদ্যে ভাতের পরেই দালের স্থান। 'মাছে-ভাতে-বাঙালী' কথাটা আজকাল একেবারেই অচল, কারণ দুর্ম্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মাছ আজকাল বাঙালী জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং দেহসংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রোটীনের জন্য শুধু বাঙালীকে নয়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোককেই বহুল পরিমাণে দালের উপর নির্ভর করতে হয়। এদেশে নানা প্রকারেব দাল জন্মে এবং লোকেও কখন বা এটা কখন বা সেটা ইচ্ছামত খায়। উত্তর-ভারতে অড়হর ও কলাইর প্রচলন বেশী; বাংলা দেশে গরীবেরা মসূর ও খেসারি দাল অধিক পরিমাণে খায়, আবার বিত্তশালী বাঙালীরা ভাজামুগ, ছোলা প্রভৃতি দাল অধিক পছন্দ করেন। দালের দাম, সুলভ্যতা, আস্বাদ ও ব্যক্তিগত রুচির উপরই এই মনোনয়ন নির্ভর করে। ভারতীয় জন-সাধারণের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রোটীনের অভাব-মোচনের জন্য ১৯৩৭ সালে ভারতীয় গবেষণা-তহবিল সংসদের (Indian Research Fund Association) পুষ্টিসম্বন্ধীয় উপদেষ্টা কমিটির তৃতীয় সম্মেলন নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন—"ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের খাদ্যতালিকার মান নির্দ্ধারণ ও বিচার করে মনে হয় যে শস্যপ্রধান ভারতীয় খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধির জন্য দালের পরিমাণ বাড়ানো

যেতে পারে।" তাঁরা তাই কোন্ দাল খাদ্য ও পুষ্টিহিসাবে কতদূর কার্য্যকর তার নির্দ্ধারণের ভার তখনকার কৃষি ও মানবপুষ্টির সংযোজক অফিসাররূপে আমার উপর অর্পণ করেন। পূর্ব্ববতন গবেষকদের পরীক্ষা-ফল এবং গবেষণাগারে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা পরীক্ষার দ্বারা আমি যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছি, তাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পূর্ব্বে দাল সম্বন্ধে খুব বেশী কোন গবেষণার কাজ এদেশে হয়নি। সম্প্রতি ঢাকা, কুনূর, বাঙ্গালোর ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কয়েকজন বিজ্ঞানী এ সম্বন্ধে কতকটা তৎপর হয়েছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত ২৩ নম্বরের স্বাস্থ্য-সমাচারে (Health Bulletin, No. 23) এদেশীয় বিভিন্ন দালের নানা উপাদানের পরিমাণ এবং "সাংঘাই খাদ্য" নামক চৈনিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ৮ নম্বরের প্রচারপত্রে চৈনিক বিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্ণীত তত্রত্য দাল-সমূহের উপাদানগুলির পরিমাণ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিতে বিভিন্ন দালের প্রোটীনগুলির দেহসংগঠনে অথবা দেহের ক্ষয়-নিবারণে প্রকৃত মূল্য অথবা কোন্‌টি কি পরিমাণে মানুষের পক্ষে হজম করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিচার করা হয়নি। এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে।

(১) প্রত্যেকটি দালই কি একইরূপ পুষ্টিকর, না তাদের পুষ্টিকারিতার পার্থক্য আছে?

(২) শস্য-প্রধান ভারতীয় খাদ্যে দালগুলি কি অধিক

পরিমাণে খাওয়া চলে? যদি না চলে, তবে শস্যের কি অনু-পাতে দাল খেলে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে?

(৩) বহুকাল ধরে অত্যধিক দাল খেলে কি বৃক্ক, যকৃৎ প্রভৃতির উপর চাপ পড়ে?

(৪) যদি ঐরূপ চাপের ফলে এ সকল প্রধান দেহযন্ত্র আংশিকভাবে বিকল হয় তা'হলে দালের সঙ্গে আব কি খেলে এরূপ ক্ষয়-বিকৃতি বন্ধ করা যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দালের প্রোটীনকে যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহ-সংগঠনে নিয়োগ করা যেতে পাবে?

বিভিন্ন স্থানে এদেশীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ লব্ধ গবেষণা-ফল তুলনা ক'রে প্রথম প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্নের সমাধানের জন্য গবেষণাগারে নূতন নূতন গবেষণা-পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

নানা দেশের পুষ্টিবিজ্ঞানীদের নির্ণীত ফলের মধ্যে, এমন কি এদেশীয় নানা গবেষকের লব্ধ ফলের মধ্যেও সামঞ্জস্যের একান্ত অভাব দেখতে পাওয়া যায়। এতৎসত্ত্বেও ঐ সকল ফলের একত্রে তুলনামূলক বিচার খুবই শিক্ষাপ্রদ। খাদ্য-হিসাবে দালগুলি শতকরা ১০ ভাগ গ্রহণীয় বলে ধরে নিয়ে বিভিন্ন গবেষক-নির্ণীত দালগুলির সুপাচ্যতা, দেহক্ষয়-পরিপূরণে বিশেষ মূল্য (Biological value) এবং প্রোটীনের সম্পূর্ণ পরিমাণ ও লভ্যাংশের তুলনামূলক বিচার পরপৃষ্ঠায় প্রথম তালিকাটিতে দেখানো গেল।

প্রথম তালিকা

নম্বর	নাম	সুপাচ্যতা (শতকরা)			দেহগঠন-মূল্য (শতকরা)			প্রোটীনের লভ্য অংশ (শতকরা)			প্রোটীনের সমগ্র পরিমাণ (শতকরা)		
		এস্. পি নিয়োগী ও সহযোগিগণ	কে. পি. বসু ও তৎসহযোগিগণ	স্বামীনাথন	নিয়োগী প্রভৃতি	বসু প্রভৃতি	স্বামীনাথন	নিয়োগী প্রভৃতি	বসু প্রভৃতি	স্বামীনাথন	নিয়োগী প্রভৃতি	বসু প্রভৃতি	স্বামীনাথন
১	ছোলা	৭৬	...	৮৬	৭৮	...	৬২	১৬·৬৮	.	১১·৭৮	২৮·১৪	...	২১·৬৮
২	মুগ	৮৩	৯০	৮৬	৬০	৫২	৫১	১৩·৯২	১০·৪	১০·৪৪	২৫·২৫	২৩·২৬	২৪·৭৭
৩	অড়হর	৭১	..	৭৫	৭৪	...	৮৫ ৭২	১৩·১৪	...	১২·২৩	২৫·৬৩	...	২৩·৫৭
৪	মটর	৭০	৭০	...	৬২	৪৮	...	১১·১০	১১·৭	৭·৬৭	২১·৫৭	২০·১০	২৪ ৬৩
৫	মসুর	৭৪	৯০	৮৮	৫৮	৩২	৪১	১২ ৮৬	৬·৫	৯·২৭	২৮ ৭৪	২২·৬০	২৪·১১
৬	খেসারি	...	. .	...	...	৪১	...	...	. .	...	...	৩২·২০	...
৭	কলাই	৮২	...	৭৮	৬৪	...	৬২	১৩·৮১	...	১১·৩৬	২৫·০০	..	২৩·৫০
৮	বরবটি	৫৮	...	৭৮	৭২	...	৪৫	১০ ৮৬	...	৮·৪৭	২৬·১০	...	২৪·১২
৯	শিমবীচি	৬৫	...	৭৬	৫৭	...	৪১	১০·৬৫	...	৭·৬৭	২৮ ৭৪	...	২৪·৬৩
১০	সোয়াবীন	...	৯০	৭৬	...	৫৮	৫৪	...	২০·২	১৬·৬২	...	৪১·২০	৪২·৪১

এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার দালের বিভিন্ন এমাইনো এসিড, বিশেষতঃ আর্জ্জাইনিন, লাইসিন, ট্রিপ্টোফেন, হিষ্টাইডিন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় (essential) এমাইনো এসিড-গুলির পরিমাণের উপরও দালগুলির খাদ্যমূল্য অনেকটা নির্ভর করে। আর্জ্জাইনিনের পরিমাণ মসূরদালে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তৎপরে ছোলাতে, তৎপরে মটর দালে, তৎপরে শিমে এবং তারপরেই মুগদালে। লাইসিনের পরিমাণের ক্রমহিসাবে যথাক্রমে মটর, মুগ, ছোলা এবং শিমের স্থান; হিষ্টাইডিনের পরিমাণ-অনুযায়ী প্রথমেই খেসারি, তৎপরে ক্রমান্বয়ে কলাই, মসূর, অড়হর এবং অন্যান্য দাল; আবার ট্রিপ্টোফেনের ক্রমহিসাবে প্রথমেই সোয়াবীন, দ্বিতীয়তঃ কলাই, তৃতীয়তঃ বরবটি, চতুর্থতঃ খেসারি এবং পঞ্চমতঃ মুগের স্থান।

আবার প্রথম তালিকা হ'তে স্পষ্টই দেখা যায় যে যদিও প্রোটীনের সমগ্র পরিমাণ-হিসাবে সর্ব্বপ্রথম সোয়া-বীনের স্থানের পরেই পর পর শিম, মসূর, ছোলা ও বরবটির স্থান, তবুও সুলভ্য প্রোটীনের পরিমাণানুসারে সোয়াবীনের পরেই ক্রমান্বয়ে আসে ছোলা, অড়হর, কলাই ও মুগদাল। দেহক্ষয়-নিবারণে সবচেয়ে ভাল অড়হর, তৎপরে ক্রমান্বয়ে ছোলা, কলাই এবং বরবটি; আবার সুপাচ্যতা-হিসাবে প্রথমেই আসে মসূর, তৎপরে মুগ, তারপরে ক্রমান্বয়ে সোয়াবীন, ছোলা এবং কলাই দাল।

সুতরাং কোন কোন গুণ-হিসাবে কোন কোন দাল অন্যান্যগুলি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, আবার অন্যান্য গুণ-বিচারে

অপরাপর দাল প্রকৃষ্ট। সুতরাং কোন্‌টি হতে কোন্‌টি প্রধান বলা খুবই শক্ত। এজন্য দশটি ছেলের যোগ্যতাবিচারে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে মার্ক দিয়ে প্রত্যেকের মার্কগুলির সমষ্টিকে যোগ্যতার মাপকাঠি ধরে নিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অথবা ক্রমিক স্থান বিচার করা যায়, ঠিক তেমনি ভাবে বিচার ক'রলে দালগুলির অবস্থা যা' দাঁড়ায়, নিম্নের দ্বিতীয় তালিকায় তা দেখানো গেল।

এভাবে পরীক্ষায় ১০এর মধ্যে ৮ মার্ক পেয়ে প্রথমস্থান

দ্বিতীয় তালিকা

দাল	সমগ্র প্রোটিন	সুলভ্য প্রোটিন	দেহক্ষয়ের ক্ষতি-পূরণ-মূল্য	সুপাচ্যতা	আর্জিনিন (৩% বা ততোধিক)	লাইসিন (৭% বা ততোধিক)	হিষ্টিডিন (২% বা ততোধিক)	ট্রিপ্টোফেন (০.৮% বা ততোধিক)	সমষ্টি (মোট মার্ক)
	১	১	২	২	১	১	১	১	১০
ছোলা	১	১	২	২	১	১	—	—	৮
মুগ	—	১	—	২	১	১	—	১	৬
অড়হর	—	১	২	—	—	১	১	—	৫
মটর	১	—	২	—	১	১	—	১	৬
মসুর	১	—	—	২	১	—	১	১	৬
খেসারি	—	—	—	—	১	—	১	—	২
কলাই	—	১	২	২	১	—	১	১	৮
বরবটি	১	—	২	—	১	—	১	১	৬
শিম-বীচি	১	—	—	—	—	১	—	—	২
সোয়াবীন	১	১	—	২	—	১	—	১	৬

পেয়েছে দুটি দাল, ছোলা এবং কলাই ; তৎপর দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে পাঁচটি—মুগ, মটর, মসূর, বরবটি ও সোয়াবীন। এস্. পি. নিয়োগী ও তৎসহযোগীরাও দাল-হিসাবে ছোলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একমত ; তাদেরও মতে এই দালের প্রোটীন যেমন সুপাচ্য তেমনি দেহের মধ্যে সহজে পরিশোষিত হয় ব'লে এবং সুলভ্য প্রোটীনের পরিমাণের জন্যও ছোলার দাল খুবই পুষ্টিকর একটি খাদ্যোপাদান। মার্কিণ বিজ্ঞানী হেলারের মতে মুগদালের মধ্যে এমাইনো এসিড সিষ্টিনের অভাবসত্ত্বেও এর প্রোটীন অন্যান্য দালের প্রোটীন অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। চৈনিক বিজ্ঞানী সো-ও মনে করেন যে, মুগের মধ্যে চুন-জাতীয় (ক্যাল্সিয়াম) উপাদানের এবং খাদ্য-লবণের অভাবসত্ত্বেও এটি ভাইটামিন 'বি,'-পূর্ণ, বেশ খানিকটা ভাইটামিন 'এ'-সমন্বিত এবং দেহক্ষয়-পরিপূরণের জন্য স্বয়ংপূর্ণ মূল্যবান্ প্রোটীনযুক্ত খাদ্যোপাদান। আর একজন চৈনিক বিজ্ঞানী কিম দেখিয়েছেন যে, অঙ্কুরিত মুগদালে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' থাকে। আবার বিজ্ঞানী হেলারের মতে 'মুগদালে ক্যাল্সিয়ামের পরিমাণ খুবই কম' ; কিন্তু কুনূরের পুষ্টি-গবেষণাগারে বিশ্লেষণ—পরীক্ষার দ্বারা এই মতটি সমর্থিত হয় নি, বরং ছোলা ও মুগদালের মধ্যে ধাতব লবণগুলি যে প্রায় সমপরিমাণে আছে তাই প্রমাণিত হয়েছে ; কেবল ছোলাতে কেরোটিনের পরিমাণ মুগদালের অপেক্ষা অধিক এবং মুগদালে ভাইটামিন 'বি,'-এর পরিমাণ ছোলার অপেক্ষা অনেক বেশী, এই পার্থক্যটুকুই দেখা গিয়েছে।

তৃতীয় তালিকা

প্রোটীনের শতকরা ৮ ভাগ স্থূলভ্যতা-হিসাবে	দেহক্ষয়-নিবারণ মূল্য % (ইঁদুর ও বেচনের বাচ্চা)	সুপাচ্যতা %	দেহবৃদ্ধি এবং দেহরক্ষা-মূল্য	ওজন-বৃদ্ধির পরিমাণ (গ্রাম)
কলেছাঁটা পরিষ্কার চাল + শুখনো দুধের গুঁড়ো	৮০	৮৯	১·০৬	১২ ৬
„ + অড়হর দাল	৭০	৮১	১·২৬	৭·৪
„ + সোয়াবীন	৬৮	৮৪	১·১৩	৬·৫
„ + ছোলা	৬৬	৮৫	১·২১	৬ ৮
„ + কলাই	৬১	৮২	১·১২	৫·৯
„ + মুগ	৫৯	৯০	১·২৯	৭·৫
কলেছাঁটা পরিষ্কার চাল + শুখনো দুধের গুঁড়ো + অড়হর দাল	৯০	৮৭	১·৪৯	৮·৩
„ + „ + সোয়াবীন	৮৬	৯৩	১·৩৩	৭·৩
„ + „ + ছোলা	৮০	৯২	১·৫৯	৯·৯
„ + „ + কলাই	৭৯	৯৬	১·৮৯	৮·৩
„ + „ + মুগ	৭৭	৯৫	২·০৪	১০·৯

আবার কুনূর-গবেষণাগারে স্বামীনাথন পৃথগ্‌ভাবে কেবল ভাতের এবং ভাতসহ শুখনো মাখনতোলা দুধের গুঁড়োর সঙ্গে নানা দাল মিশিয়ে ইঁদুরদের খেতে দিয়ে যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণাফল লক্ষ্য করেছেন, পূর্ব্বের পৃষ্ঠায় তৃতীয় তালিকায় সেগুলি দেওয়া গেল।

এ তালিকা দেখে ধারণা করা যায় যে কলে ছাঁটা পরিষ্কার চালের সঙ্গে খেতে দিলে মুগই সবচেয়ে ভাল; তারপরে পর্য্যায়ক্রমে আসে অড়হর, ছোলা, সোয়াবীন এবং কলাই। কিন্তু এরূপ চাল ও দুধের গুঁড়োর সঙ্গে খেতে দিলে গুণানুসারে সর্ব্বপ্রথমই মুগের স্থান, তৎপরে ক্রমান্বয়ে ছোলা, কলাই, অড়হর এবং সোয়াবীনের স্থান।

ধাতব লবণ-হিসাবে মুগ ও মসূর দালে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ প্রায় এক, কিন্তু মুগদালে লৌহের পরিমাণ মসূর অপেক্ষা প্রায় চারগুণ অধিক। বরবটির মধ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত কম, যদিও ফস্‌ফরাস বেশ কিছু আছে; এতে লৌহের পরিমাণ মুগের চেয়ে কম হ'লেও মসূরের চেয়ে বেশী। ভাইটামিন 'এ' (কেরোটিন) থাকে সবচেয়ে বেশী ছোলা এবং মসূর দালে, মুগেও কতকটা আছে, কিন্তু বরবটিতে তা' খুবই কম; আবার মসূরদালে ভাইটামিন 'বি,' এর পরিমাণ মুগ এবং বরবটি অপেক্ষা কম হ'লেও মসূর এবং মুগদালে ভাইটামিন 'বি,' প্রায় একই পরিমাণে আছে। **সুতরাং ধাতব লবণ এবং ভাইটামিনগুলির পরিমাণ-হিসাবেও মুগদাল অন্যান্য দাল অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্‌।**

সুতরাং যে কোন দিক্ হ'তেই বিচার করা হউক না কেন বাঙালীর খাদ্যে ছোলা ও মুগদালের যোগ্যতা ও উপকারিতা অন্যান্য দাল অপেক্ষা যে অনেক বেশী তা' নিঃসন্দেহে বলা চলে। তারপরেই কলাই ও মসূরের স্থান। দালহিসাবে সোয়াবীনের বিশেষ কোন মূল্য নেই। সুতরাং বাঙালীর খাদ্যে এর প্রচলনের চেষ্টা নিরর্থক এবং কোন অবস্থাতেই সমর্থন-যোগ্য নয়।

এর পরেই আসছে প্রবন্ধের গোড়ায় উল্লিখিত দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর। তার জন্য নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণা-বিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ইঁদুর এবং খরগোশ-শাবকদের খাদ্যে অত্যধিক পরিমাণে নানা প্রকারের দাল দিয়ে যে সকল পরীক্ষা-ফল আমি লক্ষ্য করেছি, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করা গেল।

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী রোটাক-অঞ্চলের বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রতিদিনের আহার্য্য ওজন করে দেখা গিয়েছে যে সে অঞ্চলে লোকেরা সাধারণতঃ গমের রুটির সঙ্গে তিন ভাগের এক ভাগ দাল (প্রায়ই অড়হর) খেয়ে থাকে এবং তাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল। সুতরাং আমাদের পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল খাদ্যে দালের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে শস্যের অর্দ্ধেক করা যায় কিনা। অঙ্কুরিত অবস্থায় দালে যথেষ্ট ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' পাওয়া যায় ব'লে এই পরীক্ষায় দেহরক্ষক প্রোটীন, ধাতব লবণ এবং ভাইটামিন 'বি,'-সমন্বিত সিদ্ধ চালের ভাতের সঙ্গে তার অর্দ্ধেক পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের অঙ্কুরিত

গোটা দাল পৃথক্ পৃথক্ ইঁদুর-দলকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খরগোশ-শাবকগুলিকে ভাতের পরিবর্ত্তে 'ঘাস এবং তৎসহ অঙ্কুরিত অবস্থায় বিভিন্ন গোটা দাল দেওয়া হ'ত। এরূপ খাদ্য খেয়ে বেশী সংখ্যক ইদুর ও খরগোশই এক মাসের অধিক কাল বেঁচে থাকতে পারে নি। প্রত্যেকটি পরীক্ষাধীন প্রাণীর মৃত্যুর পরে তাকে কেটে তার যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতিকে পরীক্ষা করে (বাহ্যদৃষ্টিতে এবং অণুবীক্ষণ-সাহায্যে) দেখা গেল যে যকৃৎ ও বৃক্কের নানারূপ ক্ষয়বিকৃতিই তাদের মৃত্যুর কারণ। এমন কি যে সকল পরীক্ষাধীন প্রাণী বেঁচে ছিল, তাদেরও মেরে তৎক্ষণাৎ কেটে যকৃৎ ও বৃক্কগুলির পরীক্ষাতেও একইরূপ ক্ষয়-বিকৃতির সূচনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং এ পরীক্ষার ফলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে মানুষের খাদ্যে দালের পরিমাণ অত্যধিক থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, এবং অত্যধিক খেলে সুফলের চেয়ে কুফলের আশঙ্কাই বেশী। কিন্তু রোটাকের লোকের খাদ্যে শস্যের অনুপাতে দালের পরিমাণ ৩ : ১ থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন অসুখ করে না কেন? এ প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য আবার অনেকগুলি ইঁদুরকে কতকগুলি দলে বিভক্ত করে, তাদের পূর্ব্বোক্ত খাদ্য দিয়ে তার সঙ্গে অন্যান্য নানাজাতীয় খাদ্য পৃথক্ ভাবে মিশিয়ে, কি করে ঐ খাদ্য-জনিত বিষ-ক্রিয়া বন্ধ করা যায় বহুদিন ধরে সে পরীক্ষা চললো। তাতে দেখা গেল যে ঐ খাদ্যের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে প্রচুর পরিমাণে ঘি, মাখন কিংবা দুধ, অথবা ঈষ্ট্, কডলিভার তেল, শাক-পাতা,

গাজর কিংবা ঈষ্ট্ হতে প্রস্তুত রেডিয়োষ্টোল (B. D. H.)-নামক ঔষুধটি খেতে দিলে প্রাণিগুলির যকৃৎ ও বৃক্ক বিকল ত হয়ই না, বরং তাদের ওজন বাড়তে থাকে এবং তারা সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকে। এ পরীক্ষা-ফল হতে রোটাকের প্রচুর দাল-সমন্বিত খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের যথার্থ জবাব পাওয়া গেল, কারণ রোটাকের অধিবাসীদের খাদ্যে রুটি ও দালের সঙ্গে দুধ, ঘি, মাখন এবং শাকপাতা, গাজর প্রভৃতির পরিমাণও নগণ্য নয়। সুতরাং রুটিই হোক, আর ভাতই হোক, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দাল খেয়ে তার দ্বারা দেহে প্রোটীনের প্রয়োজন মিটাতে হলে ঐ সকল পরিপূরক খাদ্যও অবশ্যই কতকটা খাওয়া চাই। এইগুলির মধ্যে দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য; তবে শাক-পাতা, গাজর প্রভৃতি সেরূপ নয় বলে বাঙালীর খাদ্যে অবশ্যই সেইগুলির পরিমাণ বাড়ানো উচিত। অভাবে প্রতিদিন কয়েক ফোঁটা কড্লিভার অয়েল কিংবা হাঙ্গরের যকৃৎ-নিঃসৃত তেল হলেও চলতে পারে।

উল্লিখিত গবেষণা-ফল হতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উপরিলিখিত প্রত্যেকটি পরিপূরক খাদ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন অত্যাবশ্যক সহকারী উপাদান আছে, যার দ্বারা দালের অত্যধিক পরিমিত এমাইনো এসিডগুলির বিষময়ক্রিয়ার প্রতিষেধ হয় ব'লে তা' খাওয়া সত্ত্বেও যকৃৎ, মূত্রপিণ্ড প্রভৃতি ক্ষয়-বিকৃতির হাত হতে রক্ষা পায়।

এই প্রতিষেধক উপাদানটি স্নেহ-জাতীয় অথবা ভাইটামিন 'এ'-পূর্ব্ব-উপাদান বা কেরোটিন-জাতীয় বস্তু? কড্‌লিভার তেল, ঘি, মাখন, রেডিয়োষ্টোল প্রভৃতি স্নেহজাতীয় উপাদান এবং ঐগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কেরোটিন বা তজ্জাত ভাইটামিন আছে, দুধেও কতকটা স্নেহোপাদান এবং কেরোটিন আছে। আবার শাকপাতা ও গাজর প্রভৃতিতে স্নেহোপাদান নাই কিন্তু কেরোটিন আছে যথেষ্ট। পরিপূরক-হিসাবে নারিকেল তেল, প্রাণিদেহের চর্ব্বি প্রভৃতি দিয়ে কোন ফলই পাওয়া যায় নি। আবার মাখন গালাতে গালাতে বহুক্ষণ ধরে অক্সিজেন গ্যাস তার মধ্যে চালিয়ে ভাইটামিন 'এ'কে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ঐ মাখনকে পরিপূরক-হিসাবে খেতে দিয়ে দেখা গিয়েছে যে তাতেও প্রতিষেধক গুণ নষ্ট হয়নি। একইভাবে ঈষ্ট্, রেডিয়োষ্টোল এবং গাজরকেও অটোক্লেভ-সাহায্যে ভাইটামিন-বিযুক্ত অবস্থায় পরিপূরকরূপে খেতে দিয়েও প্রতি-ষেধক উপাদানটি নষ্ট হয়নি বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং প্রতিষেধক উপাদানটি যে সাধারণ স্নেহপদার্থ, ভাইটামিন 'এ' বা কেরোটিন, কিংবা ভাইটামিন 'বি১' অথবা 'সি' হ'তে ভিন্ন সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নেই। এবং আরও বলা যেতে পারে যে অত্যুত্তাপে এবং অক্সিজেন-সংযোগেও এ উপাদানটির গুণ নষ্ট হয় না। সুতরাং আমার মতে এটি একটি স্বতন্ত্র ভাইটামিন এবং ক্রিয়ানুসারে ইহার জন্য ামাইনো এসিডের বিষম এবং বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক

ভাইটামিন' (Antiaminotoxic factor বা সংক্ষেপে A-a factor) এই নাম প্রস্তাব করি।

বাঙালীর খাদ্য-তালিকায় দালের পরিমাণ সাধারণতঃ ভাতের পরিমাণের এক চতুর্থাংশের অধিক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ছোলা ও মুগদালই অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত, তবে কলাই, মসূর প্রভৃতিও সময়ে সময়ে খাওয়া যেতে পারে। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, হিন্দু ঘরের বিধবা এবং নিরামিষাশী অন্যান্য লোকেরাও মসূরদাল খেতে চান না, কারণ গোঁড়া ব্যক্তিদের নিকট এ দালটি গোমাংসের তুল্য। কিন্তু প্রোটীনের পরিমাণাধিক্য, সুপাচ্যতা, যথেষ্ট পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস ও ভাইটামিন 'বি,' এবং আর্জ্জাইনিন, হিষ্টাইডিন ও ট্রিপ্টোফেন নামক তিনটি অত্যাবশ্যক এমাইনো এসিডের অস্তিত্বের জন্য এবং অপেক্ষাকৃত সুলভ ব'লেও অন্য দালের অভাবে এ দালও কতকটা খাওয়া যেতে পারে; এ দালটি সম্বন্ধে লোকের কোনও অহেতুক মিথ্যাধারণা থাকা উচিত নয়। খেসারি-দাল না খাওয়াই ভাল; কারণ এর খাদ্য-মূল্য অত্যন্ত কম এবং অধিক পরিমাণে খেলে এর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই (একত্র ফসলের জন্য) অনুরূপ আকার এবং রঙ-বিশিষ্ট আখ্‌তা নামক এক প্রকারের বিষাক্ত বীজ মিশে থাকে ব'লে ল্যাথিরিজ্‌ম-নামক খঞ্জতা-রোগ জন্মে; তাতে লোক একেবারে অকেজো এবং চলনশক্তিরহিত হয়ে পড়ে।

প্রতিদিন অল্পপরিমাণে অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ কিংবা কলাই

আদা অথবা কাঁচালঙ্কা ও লবণ-সহযোগে, কিংবা গুড় ও নারিকেলযোগে খেলে যথেষ্ট উপকার হওয়ার সম্ভাবনা; কারণ এভাবে খেলে তা' খেতেও যেমন ভাল লাগবে, আবার তেমনি খাদ্যে এর ফলে ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি'র* অভাব আর থাকবে না। একটি পাত্রে খানিকটা গোটা দালে ঠাণ্ডা জল ঢেলে সারারাত্রি রেখে পরদিন জলটুকু ফেলে দিয়ে দালকে একটি কম্বল বা চট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে তা' বেশ গরম থাকে। চব্বিশ ঘণ্টা এরূপ রেখে ঢাকনি খুলে নিলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে প্রত্যেকটি গোটা দাল হতে একটি ছোট সাদা কল বের হয়েছে। এ অবস্থায় অথবা তার পরদিন যখন কলটি প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয়ে যাবে, তখন যে ভাবে ইচ্ছে তা খেলেই যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিনগুলি পাওয়া যাবে।

দালের একঘেয়েত্ব নষ্ট ক'রবার জন্য সময়ে সময়ে বড়ি, পাঁপড়, ধোকা, দালপুরী, কচুরি এবং খিচুড়ী প্রস্তুত করেও খাওয়া যায়। বেশন হতেও নানা মুখরোচক খাদ্যবস্তু তৈয়ারি হতে পারে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে দাল বাঙালীর খাদ্যের একটা প্রধান উপাদান হ'লেও বাংলাদেশে দালের চাষ চাহিদার অনুপাতে

* অঙ্কুরিত অবস্থায় বিভিন্ন খাদ্যশস্যের এস্করবিক এসিডের (ভাইটামিন 'সি') সহিত তুলনায় অঙ্কুরিত গোটা দালে ঐ উপাদানের পরিমাণ অনেক বেশী। দৃষ্টান্তস্থলে যখন অঙ্কুরিত অবস্থায় ধান, যব ও ভুট্টায় থাকে প্রতি ১০০ গ্রামে যথাক্রমে ১৮·৭, ১৬·২ ও ১৬·৮ মি. গ্রা. তখন অঙ্কুরিত মুগ, কলাই ও ছোলাতে, প্রতি ১০০ গ্রামে থাকে যথাক্রমে ৮৮·১, ৭৬·৪ ও ৪২·২ মি. গ্রা.।

অত্যন্ত কম। ফলে বাংলাকে খাদ্যের এই প্রধান উপাদানের জন্য মুখ্যতঃ বিহার এবং অংশতঃ অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর ক'রতে হয়। এ প্রদেশে যতদূর পারা যায় ছোলা, মুগ, মসূর, কলাই প্রভৃতি দালের চাষ বাড়ানো উচিত। তাতে বাঙালীর খাদ্যে প্রোটীনের অভাব অনেকটা মিটবে এবং জমিরও উৎপাদিকা শক্তি কতক পরিমাণে বাড়বে, কারণ শিম-জাতীয় উদ্ভিদ্গুলির শিকড়-সংলগ্ন গুটিকাতে একপ্রকার জীবাণু থাকে। বাতাসে যে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে ঐ জীবাণুগুলি তার কতকাংশকে জমিতে টেনে আটকে রাখে ব'লে ঐ জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুলাংশে বেড়ে যায়। সুতরাং জমিতে দাল বা দালজাতীয় উদ্ভিদের ফসলের পর যে ফসল জন্মানো হয় তার পরিমাণ ও পুষ্টিকারিতা দুইই অনেক বেশী হয়। সুতরাং বাংলাদেশের যে সকল জমি ক্রমাগত সারের অভাবে নিঃসার এবং নিঃস্ব হতে চলেছে, সে সকল জমিতে অন্য ফসলের মাঝামাঝি সময়ে নানা প্রকারের দাল-চাষের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙালীর খাদ্যে দুধ

'বাঙালীর খাদ্যে দুধ' কথাটি আজকালকার দিনে একটা নিছক পরিহাসের মতই শোনায়। অথচ এককালে বাংলার ঘরে ঘরে গোলাভরা ধানের সঙ্গে গোয়ালভরা গরুর অভাব ছিল না; একথা ছেলেবেলায় ঠাকুর্দ্দা, দাদামশাই প্রভৃতি বৃদ্ধদের মুখে সর্ব্বদা শুনেছি। আজ শতকরা নিরান্নবুইটি বাড়ীতেই গোয়ালের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নেই; আর মুষ্টিমেয় যে ক'টি বাড়ীতে তা' আছে সেখানে হয়ত শিবরাত্রির সলতের মত জীর্ণা, শীর্ণা, হাড়পাঁজরা-সার দু'একজন গো-মাতা আছেন; না হয় তাদের কোন সেবা-যত্ন, না দেন তারা দিনে আধসেরের চেয়ে বেশী দুধ। তার উপর দুধের নামে যে সাদা জলের (অর্থাৎ দুধের সঙ্গে জলের পরিবর্ত্তে জলের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে) ব্যবসা চলছে, তার ষোল আনাই বিহার অথবা যুক্তপ্রদেশের বেনারস, মির্জ্জাপুর কিংবা গোরক্ষপুরের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের হাতে। আবার বড় বড় শহরে দুধ-ব্যবসায়ী নামকরা বিদেশী প্রতিষ্ঠান যে ক'টি আছে, তারাও গোয়ালাদের নিকট হতে মহিষের দুধ কিনে, মাখনের কতকটা অংশ তুলে গরুর দুধের মত করে নিয়ে, তাই বোতলে পুরে গরুর দুধ বলে চালাচ্ছে। সঙ্গতিপন্ন বাঙালীরা, অর্থাৎ যাদের কেনবার মত পয়সা আছে, তারা খুসী হয়ে একটাকা কিংবা দেড়টাকা সের দরে ঐ বস্তু কিনে দুধের

আশা সাদা জলে কিংবা ভেজালে মেটাচ্ছেন। তা খেয়ে বাঙালীর ছেঁলেমেয়ে যে দৈর্ঘ্যে বাড়বে কিংবা বল পাবে তা' দুরাশামাত্র। যাঁদের কিছু পয়সা আছে অথচ বেশী নেই, তাঁরা দিনে একবার কিংবা দুবার এবং বাড়ীর গিন্নীরা কয়েকবার (?) এক চামচ টিনের দুধ কিংবা দুধের গুঁড়ো সংযোগে চা তৈয়ারি করে দুধের আশা চা দিয়ে মেটাচ্ছেন। তার চেয়েও নীচুস্তরের যারা, তাদের দুধের 'পরশ'-জনিত কোন বালাই নেই। সুতরাং বাঙালীর খাদ্যে দুধ 'আকাশ-কুসুমে'র সঙ্গে তুলনীয় হ'লেও শিশু, গর্ভিনী, স্তন্যদাত্রী জননী এবং রোগীদের জন্য দুধ একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ব'লেই এ সম্বন্ধে কতকটা আলোচনা আবশ্যক।

বাঙালীর খাটো গড়ন, স্বাস্থ্যহীনতা, স্নায়ুর চাঞ্চল্য প্রভৃতির মূলে খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের অভাব। শিশুকাল হ'তে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ও ডিম খেতে পেলে শুধু যে ক্যাল্‌সিয়ামের অভাবই দূর হয় এমন নয়, ঐ দুটি উপাদানের প্রথমটিতে ক্যাজিনোজেন এবং দ্বিতীয়টিতে ভাইটেলিন নামক দুটি ফস্‌ফরাসযুক্ত প্রোটীন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' প্রচুর থাকাতে শিশুর দেহ ও মন যত সহজে বেড়ে উঠতে পারে, অন্য কোন খাদ্যের দ্বারা সেটুকু সম্ভবপর নয়। সুতরাং দেহ ও মনের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য ঐ দুটি খাদ্য শিশুর পক্ষে অত্যাবশ্যক। মানুষ সাধারণতঃ গরু, মহিষ, ছাগল কিংবা গাধার দুধ পান করে থাকে। বাঙালীরা গরুর দুধই পছন্দ করে, কিন্তু উত্তর

ভারতের সর্ব্বত্র মহিষের দুধের প্রচলনই বেশী, যদিও পশ্চিম-পাঞ্জাবে এবং সিন্ধুপ্রদেশেই সবচেয়ে ভাল গরু পাওয়া যায়, এবং দুধও দেয় তারা অনেক বেশী। একবার লায়ালপুরে কোন এক শিখ-বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি তাঁর তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একটা মহিষের নীচে বসে তার বাঁটথেকে ঠিক বাছুরের মত দুধ চুষে নিচ্ছে। দৃশ্যটা অপূর্ব্ব, অচিন্ত্যনীয় এবং অস্বাভাবিক ব'লে আমি হাঁ করে তাকিয়ে দেখছি দেখে বন্ধুটি হেসে বল্লেন যে ছেলেবেলায় তিনিও নাকি এমনি করে মহিষের দুধ পান করে মানুষ হয়েছেন এবং কতকটা রসিকতা এবং কতকটা অবজ্ঞার ভাবে বললেন "ডাক্তার সা'ব, আপনারা বাংলা মুলুকে ছাগলের মত আকাবের গরুর দুধ পান করেন, আর আমরা পান করি অত বড় মহিষেব দুধ; সুতরাং আপনারা যখন আপনাদের গোমাতার শারীরিক গঠন পান, আমরা পাই ঐ মহিষের মত বলিষ্ঠ গড়ন; তার জল্‌জ্যান্ত প্রমাণ আপনি আর আমি।" শিখবন্ধুটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ'ফুট এবং প্রস্থেও তদনুরূপ। তাঁর কথা শুনে আমি একবার নিজের দিকে এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে হেসে বললুম "সর্দ্দারজি, আপনি একটি কথার মত কথা বলেছেন, আমি একথাটি বাংলা দেশে সঙ্গে নিয়ে যাবো।" 'বাঙালীর খাদ্যে দুধ'এর প্রসঙ্গে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে এ ঘটনাটি উল্লেখ না করে পারলুম না।

বাংলা দেশে সাধারণতঃ পেটরোগা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরই ছাগলের দুধ খাওয়ানো হয়। গাধার দুধ তত

সহজে পাওয়া যায় না। যে সকল দুর্ভাগ্য শিশুদের জন্মের পরেই কিংবা অতি শৈশবে মা মরে যায়, সম্ভব হলে তাদের জন্য গাধার দুধের ব্যবস্থা করা ভাল।

তুলনামূলক ভাবে নীচে বিভিন্ন দুধের নানা উপাদানের পরিমাণগুলি দেওয়া গেল।

বিভিন্ন দুধের প্রধান উপাদান সমূহের পরিমাণ

	প্রোটীন %	স্নেহ-উপাদান %	শর্করা %	ধাতব-লবণ %	জল %
স্তন-দুধ	১·৬	৩—৪	৬—৭	০·২—০·৩	৮৭·৫
গরুর দুধ	২·৫—৩	৩·৫—৪	৪—৫	০·৬—০·৭	৮৭
মহিষের দুধ	৪·৫২	৮·২	৪·৬	০·৮৮	৮১·৮
ছাগলের দুধ	২—২·৫	৩—৩·৫	৪—৫	০·৯	৮৭
গাধার দুধ	১·৭৯	১·০২	৫·৫	০·৪২	৯১·১৭

উপরের তালিকা হ'তে স্পষ্টই দেখা যাবে যে মানুষের দুধের তুলনায় গরুর দুধে প্রোটীন থাকে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ, স্নেহ-উপাদান ও জলীয় ভাগ প্রায় সমান, ল্যাক্‌টোজ (শর্করা) থাকে তিনভাগের দুভাগ এবং ধাতব-লবণগুলি প্রায় তিনগুণ। সুতরাং গরুর দুধ বাছুরের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য হ'লেও মানবশিশুর পক্ষে ঠিক উপযোগী খাদ্য নয়। তাই শিশুদের

গরুর দুধ পান ক'রতে দেওয়ার পূর্ব্বে তাকে যতটা সম্ভব মাতৃস্তন্যের অনুরূপ করে নেওয়া উচিত*, তা না হ'লে শিশুর পক্ষে তা পরিপাক করা শক্ত হয় ও পরিণামে যকৃৎ-রোগ অবশ্যম্ভাবী।

গরুর দুধের তুলনায় মহিষের দুধে জলীয় উপাদান প্রায় শতকরা ৭ ভাগ কম, শর্করা প্রায় সমান এবং অন্যান্য সব উপাদানগুলিই পরিমাণে অধিক থাকে। মহিষের দুধে প্রোটীনের পরিমাণ প্রায় দেড়গুণ বেশী, স্নেহ-উপাদান বা মাখন প্রায় দ্বিগুণ এবং ধাতব-লবণগুলিও প্রায় দেড়গুণ বেশী। গোয়ালারা তাই মহিষের দুধের কতকটা মাখন তুলে নিয়ে, তাতে খানিকটা জল মিশিয়ে ঐ দুধকে অনায়াসে গরুর খাঁটি দুধ ব'লে চালিয়ে দেয়। এখন বিদেশী দুধের কোম্পানীগুলিও মাখন তুলে নিয়ে মহিষের দুধকে গরুর দুধ ব'লে বিক্রি করছে।

তুলনায় ছাগলের দুধ অনেকটা গরুর দুধের অনুরূপ ; কারণ দুটিতেই জল, প্রোটীন, স্নেহ-উপাদান এবং ল্যাক্‌টোজের পরিমাণ এক, কেবল ছাগলের দুধে ধাতব-লবণের পরিমাণ গরুর দুধের প্রায় দেড়গুণ।

গাধার দুধ কিন্তু অনেকটা মাতৃস্তন্যেরই মত, কারণ উভয়ের প্রোটীন এবং শর্করার পরিমাণ প্রায় একই, জলীয়ভাগ গাধার দুধে একটু বেশী, স্নেহ-উপাদান বা মাখন মাতৃস্তন্যের

* লেখক-প্রণীত 'রোগীর পথ্য' পুস্তিকার 'শিশুর খাদ্য ও পথ্য' নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এবং ধাতব-লবণগুলি অপেক্ষাকৃত সামান্য বেশী।

সুতরাং পুষ্টিকারিতা-হিসাবে মহিষের দুধ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, গরুর দুধ ও ছাগলের দুধ প্রায় সমান এবং গাধার দুধ নিকৃষ্ট। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে মহিষের দুধ অত্যন্ত গুরুপাক বলে তা' দেওয়া মোটেই উচিত নয়; ছাগলের দুধও দিতে হ'লে তাকে মাতৃস্তন্যের অনুরূপ উপাদান-সম্পন্ন ক'রে দিতে হবে; কিন্তু গাধার দুধ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়ই দেওয়া চলে। বাংলাদেশে হিন্দু-বিধবা প্রভৃতি নিরামিষাশী বহু লোক আছেন, জৈব প্রোটীনের জন্য দুধই তাঁদের একমাত্র সম্বল। আমিষাশী বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সুস্থাবস্থায় দুধের প্রয়োজন না থাকলেও নিরামিষাশী যাঁরা তাঁদের সকলেরই প্রত্যহ কিছু না কিছু দুধ পান করা উচিত। গর্ভিণী, প্রসূতি এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বাঙালীর খাদ্যে দুধের পরিমাণ বাড়াতে হলে অন্যান্য প্রদেশের মতই গরুর পরিবর্ত্তে অধিকসংখ্যক মহিষ পালন করা উচিত। মহিষের দুধের অধিকতর পুষ্টিকারিতার কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে; তাছাড়া মহিষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিশ্রম কম এবং মহিষ দুধও দেয় গরুর তুলনায় পরিমাণে অনেক বেশী। যে সকল জলাভূমিতে গরুকে রাখা আয়াস-সাধ্য, সে সকল স্থানে মহিষ বেশ সুস্থভাবে মনের আনন্দে বেঁচে থাকতে পারে। গরুর বলদের চেয়ে মহিষের বলদ অনেক বেশী শক্তিশালী ও পরিশ্রমক্ষম।

গরু পালন করতে হ'লে বাঙলা দেশের খারাপ জাতের গরু একেবারে বাদ দিতে হবে। কারণ প্রতিদিন দু'টাকার অথবা দুজন লোকের খাবার (কেনাই হউক কিংবা ক্ষেতের উৎপন্নই হউক) খাইয়ে যদি দিনে আধসের মাত্র দুধ পাওয়া যায়, তাহলে অচিরেই দেউলে হ'তে হবে। পাঞ্জাব কিংবা সিন্ধুপ্রদেশ হ'তে ভাল ষাঁড় আনিয়ে এদেশের সব চেয়ে ভাল যে অল্পসংখ্যক গরু এখনো টিকে আছে, এ দু'এর সংমিশ্রণে বাংলায় উন্নত-জাতীয় গরুর সৃষ্টি ক'রতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে গরুর দুধের পরিমাণ তার মাতৃধারার উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে তার পিতৃধারার উপর। এজন্য এদেশে বেশি দুধের গরুর জাত সৃষ্টি করতে হলে পশ্চিম দেশ হতে যে ষাঁড়ের জননী প্রচুর দুগ্ধবতী ছিল এমনি ষাঁড় আমদানি করতে হবে। যার বংশ-পরিচয় জানা নাই এমন ষাঁড় কখনই পাল দেবার জন্য নিযুক্ত করা উচিত হবে না। কেউ কেউ মনে করেন যে, গরু এবং ষাঁড় দুইই পশ্চিম হতে আমদানি করা উচিত। কিন্তু এরূপ সম্পুর্ণ বিদেশী গোজাতির বাংলা দেশের আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং জাতের উন্নতি এবং স্থায়িত্ব এই উভয় বিবেচনায় পশ্চিম-দেশীয় ভাল জাতের ষাঁড় এবং বাংলার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত এই দেশীয় ভাল গরুর পরস্পর সংমিশ্রণে উন্নত জাতের গরুর সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। তারপর গরুর বাছুর হওয়ামাত্র তাকে গরুর কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে এবং দুধ দুইয়ে

বাছুরকে যতটা আবশ্যক খাইয়ে, বাকিটা গৃহস্থ গ্রহণ করবে। এই ব্যবস্থায় বাছুরের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং কোন কারণে হঠাৎ বাছুর মরে গেলেও গরুর দুধ পাওয়া বন্ধ হবে না। গোয়ালাদের অনেক সময়ে অসাবধানতার জন্য 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট' হয়। তারা অতি লাভের আশায় গরুর বাঁট হ'তে শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত দুধ টেনে নিয়ে বাছুরকে বঞ্চিত করার ফলে অর্দ্ধেকেরও বেশী সংখ্যক বাছুর তিন-চার মাসের মধ্যেই মরে যায়। তখন গরু দুধ দেওয়া বন্ধ করার আশঙ্কায় তারা ঐ বাছুরের চামড়া ও মাথা দিয়ে একটা নকল বাছুর তৈয়ারি করে তাই গরুকে দেখিয়ে যতটুকু পারে দুধ দুইয়ে নিতে চেষ্টা করে। কলিকাতার রাস্তায় এ রকম দৃষ্টিকটু দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু ক'জন লোক তার প্রতিবাদ করেন? এ ভাবেও অধিককাল দুধ দোহা সম্ভব হয় না, সুতরাং অতিলোভের ফলে একূল-ওকূল দুকূলই, অর্থাৎ বাছুর এবং দুধ দুইই তারা হারায়।

যেখানে গরু কিংবা মহিষ রাখা সম্ভবপর নয়, সেখানে রাম-ছাগল রাখার চেষ্টা করা উচিত। গরুর তুলনায় ছাগলের দুধের পরিমাণ কম হ'লেও ছাগল-পোষা অনেকটা সহজসাধ্য ব্যাপার। "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়?" এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রবচন। ঘাস, লতা-পাতা, তরকারির খোসা সবই ছাগলের খাদ্য। গরু, মহিষ প্রভৃতি যে সকল উঁচু পাহাড় বা টিলায় চরতে পারে না, ছাগলেরা অতি সহজে সে সকল স্থানে গিয়ে নিজেদের

খাদ্য আহরণ ক'রতে পারে। কিন্তু বাড়ীতে ছাগল রাখার বিড়ম্বনাও কম নয়, কারণ দশ টাকা দামের একটি ছাগল অনায়াসে একদিনে হাজার টাকার একটা বাগানের সর্ব্বনাশ করে বসতে পারে।

জাতিকে সুস্থ এবং সবল করে তুলতে হ'লে শিশু, জননী, গর্ভিণী এবং রুগ্নব্যক্তিদের জন্য দুধের ব্যবস্থা চাই-ই চাই। এজন্য হয় সরকারী ব্যবস্থায় না হয় জনসাধারণের সমবায়-প্রচেষ্টায় মহিষ, গরু এবং ছাগলের পালনের জন্য দেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রতে হবে। প্রতি গ্রামে যাতে এরূপ একটি দুধের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। মানুষের খাদ্যের চাষের সঙ্গে নানাপ্রকারের ঘাসের চাষ এবং সোয়াবীন প্রভৃতি গরুর অন্যান্য খাদ্যের ফসলও ফলাতে হবে। গোচারণের জন্য উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে গরু দিনে অন্ততঃ দু'তিন ঘণ্টার জন্যও কাঁচাঘাস খেতে পারবে ও তার গায়ে প্রচুর সূর্য্যালোক লাগবে ; কারণ দুধে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র পরিমাণ বাড়াতে হলে গরুর পক্ষে কাঁচাঘাস ও সূর্য্যকিরণ অপরিহার্য্য। প্রতি সপ্তাহে একবার সকল গরুকে ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং যদি কোন সন্দেহ জাগে যে কোন গরুর বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি কোনও প্রকারের রোগ হয়েছে তখনই তাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। অনেকগুলি গরু, মহিষ বা ছাগলের দুধ একত্রিত করে ঐ একত্রীকৃত দুধই সকলকে দিতে হবে, যার যার প্রাপ্য বরাদ্দ-মত। যদি কোন গরুর

দুধে কোন অত্যাবশ্যক উপাদান কম থাকে, তবে অনেকগুলি গরুর দুধকে একত্র মিশিয়ে নিলে ঐ মিশ্রিত দুধে সকল উপাদানই স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যাবে। যতদিন দেশে প্রচুর দুধের বন্দোবস্ত না হবে, ততদিন রেশন-প্রথার প্রবর্ত্তনে যাতে কেবল শিশু, গর্ভিণী, স্তন্যদাত্রী জননী এবং রুগ্ন ব্যক্তিরাই দুধ পায়, যতদূর সম্ভব শীগ্‌গির তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। অবশ্য যদি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে নিজপ্রয়োজনমত দুধের জন্য মহিষ, গরু কিংবা ছাগল থাকে, তাহ'লে তাকে তা' রাখতে দেওয়াই উচিত; কিন্তু যাদের দুধের একান্ত প্রয়োজন, তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য তাকে তার নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত দুধ অবশ্যই সরকারী কিংবা বেসরকারী সমবায় প্রতিষ্ঠানের হাতে উপযুক্ত মূল্যে তুলে দিতে হবে।

দুধের রেশন-প্রথার প্রবর্ত্তনে বাঙালীর খাদ্যে প্রয়োজনমত দুধের বন্দোবস্তের কতকটা সাহায্য হলেও তাতে দুধের সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে ব'লে মনে হয় না। নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক দুধ উৎপন্ন হয়। ঐ দুটি দেশ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মাখন, পনীর, ক্রীম, ঘনীভূত দুধ, শুখনো দুধের গুঁড়ো, কিংবা হর্লিক্‌স্ ও নেস্‌ল্‌স্ মল্টেড মিল্কের আকারে দুধ হতে প্রস্তুত নানা খাদ্যসম্ভার রপ্তানি করে। একমাত্র ইন্দোনেশিয়া ব্যতীত ভারতবর্ষ, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশই তাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সুতরাং বর্ত্তমানে

এদেশীয় গভর্ণমেণ্টের ঐ দুটি প্রতিবেশী খাদ্যবহুল দেশের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পারস্পরিক সুবিধার সর্ত্তে অবিলম্বে এমন একটা চুক্তি হওয়া উচিত যাতে এদেশের নানা পণ্যের বিনিময়ে ভারতবর্ষ তাদের কাছ হতে নিজ প্রয়োজনমত দুগ্ধজাত খাদ্য পেতে পারে।

সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর নানা খাদ্য প্রস্তুতির জন্য দুধ হতে ছানা বের করে, দুধের অপর দুটি মূল্যবান্ প্রোটীন ল্যাক্ট্-এল্‌বুমিন ও ল্যাক্ট্-গ্লোবিউলিন, ল্যাক্‌টোজ, ধাতব-লবণ এবং কতকটা স্নেহ-পদার্থও নষ্ট করা হয়। বর্ত্তমানে দুধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আইন করে দুধ হতে ছানা তৈয়ারি বন্ধ ক'রলে এ জাতীয় অপচয় কতকটা বন্ধ হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে নানাপ্রকারের ঔষধের ইন্‌জেক্‌শনের দ্বারা স্তন-দুগ্ধের ক্ষরণ বাড়ানো সম্ভবপর হয়েছে। এমন কি অক্ষত-যোনি গরুর বাঁটেও ইন্‌জেক্‌শনের দ্বারা দুধের ক্ষরণ সম্ভবপর। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণা-বিদ্যালয়ের গোশালাতে এরূপ একটি অক্ষত-যোনি গরু কিছুকাল ধরে হর্মোন ইন্‌জেক্‌শনের পর দিনে প্রায় আধসের করে দুধ দিতে আরম্ভ করে। আমি নিজে ঐ দুধের উপাদানগুলিকে স্বাভাবিক দুধের উপাদানগুলির সঙ্গে তুলনা করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দেখতে পাই।

	স্বাভাবিক দুধ	কৃত্রিম কামধেনুর দুধ
কঠিন পদার্থ %	১২'৫৭	১৪'১২
প্রোটীন %	৩'৫৬	৩'৬৩
ক্যাজিন %	৩'০৮	২'৯৭
এল্‌বুমিন %	০'৩৬	০'৫৬
গ্লোবিউলিন %	০'১	০'০৯
মাখন %	৪'৬	৬'০
ল্যাক্‌টোজ %	৩'৬২	৩'৬১
ক্যাল্‌সিয়াম %	১'৩৬	১'৩৫
ফস্‌ফরাস %	০'২৮৮	০'২৪৩
লৌহ %	৭'৯মি. গ্রাম	৮'৭মি. গ্রাম
আপেক্ষিক গুরুত্ব	১০৩৪	১০৩৪

এ হ'তে স্পষ্টই দেখা যায় যে স্বাভাবিক দুধে যদিও ছানার অংশ অধিক তবু কৃত্রিম কামধেনুর দুধে কঠিন পদার্থ, প্রোটীন, এল্‌বুমিন, মাখন ও লৌহের পরিমাণ অধিক এবং গ্লোবিউলিন, ল্যাক্‌টোজ এবং ক্যাল্‌সিয়ামের পরিমাণ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব দুয়েরই প্রায় সমান। ইঁদুর এবং বালক-বালিকাকে খাইয়েও দেখা গিয়েছে যে ঐ বিশিষ্ট দুধের পুষ্টিকারিতাও স্বাভাবিক দুধের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

সুতরাং পশুবিশেষজ্ঞদের সাহায্যে যেসকল গরু কম দুধ দেয়, এরূপ হর্মোন-ইন্‌জেক্‌শনের দ্বারা তাঁদের দুধের পরিমাণ কতদূর বাড়ানো যেতে পারে, তাও পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং পরীক্ষার সাফল্য-অনুসারে ঐরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়েও বাংলাদেশের খাদ্যে দুধের পরিমাণ যতদূর সম্ভব বাড়াবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কেউ কেউ আবার চৈনিক পথ্য 'সোয়াবীন-দুধ' ব'লে পরিচিত বস্তুকে এ দেশে দুধের পরিবর্ত্তে প্রচলন করার জন্য আগ্রহশীল। এটুকু সকলেরই মনে রাখা উচিত যে আম-গাছে যেমন কাঁঠাল ফলে না, তেমনি কোন প্রাণীর স্তন থেকে যা বেরোয় তাই দুধ; গাছ থেকে, ফল থেকে কিংবা বীজ থেকে যা বের হয় তা' দুধের বিকল্প হতে পারে কিন্তু তা' কখনই দুধের সম-পর্য্যায়ে আসতে পারে না। সুতরাং সোয়াবীন হতে প্রস্তুত সাদা তরল পদার্থটিকে দুধ ব'লে চালানো, আর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে দুধ ব'লে পিটুলি গুলে সাদা জল খাওয়ানোর মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খাদ্যের অপচয়*

আবার 'বঙ্গলক্ষ্মী'র দিক্ থেকে অনুরোধ এসেছে যে তার জন্য আরো কিছু লিখতে হবে। কি লিখি মনে মনে যখন তোলপাড় ক'রছি, এমনি সময়ে জনৈক বন্ধু নিমন্ত্রণ ক'রতে এসে আমার সমস্যার কতকটা সমাধান করে দিলেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বললেন "নিমন্ত্রণ করেছি একশোজনকে কিন্তু ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে অন্ততঃ দেড়শোজনেব মত।" বন্ধুবর বিদায় নেওয়ার পরমুহূর্ত্তে বাড়ীতে খেতে বসে ডিমের কালিয়া এবং টমেটোর চাটনি খেতে খেতে আমার 'বঙ্গলক্ষ্মী'র জন্য লেখার বিষয় ঠিক করে নিলুম, বাঙালীর জাতীয় এবং দৈনন্দিন জীবনের একটা বিশেষ দিক্ অর্থাৎ 'অপচয়', স্বাস্থ্য, সময়, শক্তি, খাদ্য, এককথায় সবকিছুরই অপব্যয়। প্রত্যেক বঙ্গলক্ষ্মী যদি এই অপচয়ের মাত্রা যতদূর সম্ভব কমাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তবেই জাতীয় জীবনে সমষ্টিগত ভাবে তার সুফল ফলবে, তা না হলে অর্থের অপচয়ে যেমন পরিণামে দেউলে হতে হয়, তেমনি বাঙালী জাতিকে বাধ্য হয়ে, আজ কিংবা দুদিন পরে দেউলের খাতায় নাম লেখাতে হবে।

অন্যান্য দেশে যখন কেউ নিমন্ত্রণ করে, তখন যে সংখ্যক লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়, ঠিক সেই সংখ্যক লোকের জন্যই

---

* বঙ্গলক্ষ্মী, পৌষ, ১৩৫২।

খাবারের ব্যবস্থা থাকে। 'R. S. V. P.' অর্থাৎ নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে তাতে যোগ দিতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যাবেন কিনা, চিঠি লিখে তা' জানিয়ে দেওয়া পাশ্চাত্য-সমাজে এবং পৃথিবীর বহু দেশে একটা অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা, যার ফলে আমন্ত্রণকারীর পক্ষে অতিথিদের নিশ্চিত সংখ্যা জেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রবার এবং অযথা অপচয় বন্ধ করবার সুবিধা হয়। কিন্তু বাঙালী-সমাজে এটা নাকি নেহাৎ অসামাজিক এবং রীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। আবার খেতে বসে যে পর্য্যন্ত না অতিথি 'ব্যাঘ্র-ঝম্পনে' পাতের উপর ঝুঁকে পড়বেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর পাতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাবার ঢেলে দিতে হবে, তা নইলে নাকি মান থাকে না। ফলে, এ দুর্দ্দিনে সামাজিক ব্যাপারে যা' অপচয় হয় তা' শুধু অন্যায় নয়, তাকে পাপ ব'লেই মনে করা উচিত। এ সকল বড় বড় ব্যাপারে একদিনে কিছু করা সম্ভবপর নয়, কারণ 'বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে ?'—এটাই হচ্চে সমস্যা। এর জন্য এমন দু'চারজন দুঃসাহসী লোক চাই, যাঁরা নিন্দা অথবা সমালোচনায় বিচলিত না হয়ে গতানুগতিক সামাজিক আচারগুলি ভেঙে আজকালকার দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য খাদ্য-বস্তুর অযথা অপচয় বন্ধ করে সমাজকে মঙ্গলের পথ দেখাবেন।

উল্লিখিতভাবে বিশেষ বিশেষ ভূরিভোজনের ব্যাপারে অপচয় নিবারণ সময়-সাপেক্ষ; কিন্তু প্রতি বাঙালীর ঘরে প্রতিদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে খাদ্যবস্তুর এবং সময়ের

যে অহেতুক অপচয় হচ্ছে, সেটা বন্ধ করার দায়িত্ব প্রত্যেক বঙ্গনারীর। একথার উত্তরে হয়ত অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বলবেন "বা-রে, অপচয় কোথায় করি আমরা! এ দুর্দ্দিনে কে ইচ্ছা করে তা' করে? খাওয়ার শেষে ভাতের হাঁড়িতে ত এক মুঠো ভাতও পড়ে থাকে না, তবে এ অন্যায় অনুযোগ কেন?"

উত্তরে, ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে বাঙালী ঘরের প্রত্যেক মা-বোনের নিকট আমার যে নালিশ আছে, তা' বুঝিয়ে ব'লছি। প্রথমতঃ, যে সকল বাড়ীতে মাইনে করা পাচক বা পাচিকার হাতে রান্নার ভার থাকে, সে সকলস্থলে তাদের খুসীমত খাদ্যদ্রব্যের অপচয় কমবেশী হয়েই থাকে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তার শুচিতা এবং পরিচ্ছন্নতা আমাদের নিজের মা-বোনের হাতে যতখানি অব্যাহত থাকা সম্ভব, কখনই ঐ জাতীয় পরিচারক কিংবা পরিচারিকার হাতে তা' সম্ভবপর নয়। আবার যে সকল বাড়িতে মা-বোনেরা স্বহস্তে রান্নাবান্না ক'রে পিতা, পুত্র, ভাই অথবা স্বামীকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাইয়ে আনন্দ অনুভব করেন, প্রায়শঃ দেখতে পাই রান্না-ঘরেই তাঁদের সারাদিন কাটে। একবেলা খাওয়া হতে না হতেই ও বেলার খাবার তৈয়ারি করার তাড়া পড়ে যায়। প্রতি বেলায়, কবির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "ভাজাভুজি হ'ত পাঁচটা-সাতটা"; তারপর রাত্রিতে শুতে গিয়েও নিস্তার নেই, তাঁদের ভাবনা চলতে থাকে, আজ ত'

"খাড়া-বড়ি-থোড়" হোল, কাল আবার কোন "থোড়-বড়ি-খাড়া" হবে। এভাবে সারাদিন এবং আধরাত্রিও শুধু রান্না-বান্না আর তার তোড়জোড়ে সময়ের একান্ত অপচয় হয় এবং 'আগুনে পড়ি, কি জলে পড়ি'—করে করে মা-বোনেদের যে অমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর প্রতি বেলায় যদি খাবারের তালিকায় আট-দশ পদ থাকে, তাকে অপচয় ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? যে কোন পাশ্চাত্য-দেশে 'চারি পদ' খাদ্য-তালিকা ভুরিভোজনের সমান। আমার মনে পড়ে, ছেলে-বেলায় এক আত্মীয়-বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে, খাদ্য তালিকাটি বাহাত্তর পদীয় হয়েছিল; সুতরাং সেগুলির সদ্‌ব্যবহারের চেষ্টায় যা' করা হয়েছিল, তাকে খাওয়া বলে না, চেখে দেখা বলে এবং তাতেই পেট একেবারে টইটুম্বুর হয়ে গেছিল। সুতরাং খাদ্যের অপচয়-নিবারণের জন্য প্রতি বেলায় প্রতি গৃহে তিন পদীয় এবং বাহুল্যপক্ষে চতুষ্পদীয় খাদ্যতালিকার ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তন যত শীঘ্র সম্ভব কর্ত্তব্য।

এ ত' গেল পরিমাণের কথা। তারপরেই আসে খাদ্যের নিজ নিজ গুণের অপচয়ের কথা। আদিম মানুষেরা যখন গিরিগুহাবাসী কিংবা বনবাসী ছিল, তখন তারা পশু, পাখী কিংবা মাছ শিকার করে পুড়িয়ে খেতো এবং ফলমূলকে যতদূর সম্ভব কাঁচা খেয়েই সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকতো। কিন্তু সভ্যতাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে খাদ্য-প্রস্তুতির জন্য উন্নততর ব্যবস্থা ক'রতে হয়েছে, যার ফলে কাঁচা,

আধপোড়া কিংবা আধসিদ্ধ খাদ্যের বদলে সুসিদ্ধ, অতিসিদ্ধ, অতিভাজা অথবা অতি রসনাতৃপ্তিকর (পোলাও, কালিয়া, কোর্ম্মা, কোপ্তা, কাবাব প্রভৃতি) 'চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়' সে সকল সহজপাচ্য ও উপকারী প্রাক্তন খাদ্যের স্থান নিয়ে সুসভ্য মানুষের শক্তি ও স্বাস্থ্যকে ধাপে ধাপে অবনতির নিম্নস্তরে নামিয়ে দিচ্ছে! সুতরাং আধুনিক কালে বাঙালী-ঘরের রান্না সম্বন্ধে দুচারটি প্রয়োজনীয় মন্তব্য ক'রছি ব'লে, আশা করি বঙ্গনারীগণ আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চার জন্য নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ ক'রবেন না, কারণ আমার স্বপক্ষে আমি তাদের এটুকু জানিয়ে দিতে চাই (অবশ্য গোপনকথা) যে স্বগৃহে এবং বান্ধবীমহলে 'পেটুক' এবং 'খাইয়ে' ব'লে যথাক্রমে বদনাম এবং সুনাম দুইই আমার আছে।

খাদ্যকে আহার্য্যরূপে এবং পরিপাকের জন্য উপযুক্ত করে নেওয়ার জন্যই উপযুক্ত রান্নার আবশ্যকতা। রান্নার ফলে খাদ্যের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, যথা—শক্ত বস্তু সিদ্ধ হয়ে নরম হয়, খাবার উপযুক্ত যা' তা' হতে অনুপযুক্ত অংশ বিচ্ছিন্ন হয় এবং আগুনের উত্তাপে দুষ্ট জীবাণুদের বিনাশ ঘটে। রান্নার পর চাল, দাল, আটা, ময়দা প্রভৃতির শ্বেতসার-জাতীয় প্রধান উপাদানের কোষগুলি ফেটে গিয়ে সহজ-পরিপাকের উপযুক্ত হয় এবং মাছ, মাংস ডিম প্রভৃতি প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি বস্তু গরম জল কিংবা ফুটন্ত তেল বা ঘির সাহায্যে তঞ্চিত হ'য়ে উপাদেয় এবং সারবান্ খাদ্যে পরিণত হয়। একই ভাবে শাক ও

লতাপাতা-জাতীয় কাঁচা অবস্থায় দুষ্পাচ্য খাদ্য রান্নার পর সুপাচ্যতা লাভ করে। আবার লবণ-মসলা প্রভৃতির সাহায্যে আপাতঃস্বাদহীন খাদ্যও মুখরোচক এবং উপাদেয় আহার্য্যে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু উপযুক্তভাবে রান্না না হ'লে, সুসিদ্ধ এবং উপাদেয় খাদ্যের মধ্যেও যে অনেক প্রয়োজনীয় বস্তুর অপচয় ঘটে, নিম্নে তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) গুণানুসারে সিদ্ধ চালের স্থান আতপ চালের অনেক উপরে হলেও ধনী-বাঙালীর বাড়ীতে কলে ছাঁটা আতপ চালের ভাতেরই আদর বেশী। কলে ছাঁটাইর কালেই এরূপ চালের ভাইটামিন 'বি১', ফস্‌ফরাস, প্রভৃতির অপচয় হয়, তৎপরে সিদ্ধ করার পূর্ব্বে বারবার জলে ধুয়ে নেওয়াতে আর একবার অপচয় ঘটে; অবশেষে ফেনের সঙ্গেও সারবান্ অনেক কিছুই ফেলে দেওয়া হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে অসংখ্য গরীব-দুঃখী সহরে ধনীর দুয়ারে এই পরিত্যক্ত ফেন ভিক্ষা করে খেয়ে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও প্রাণরক্ষা ক'রতে পেরেছিল। সুতরাং অপচয় দূর ক'রতে হ'লে যাঁরা সর্ব্বদা আতপ চালের ভাত খান, তাঁদের উচিত (১) ঢেঁকিতে ছাঁটা পাতলা লাল আবরণ সমেত চাল যোগাড় করা, (২) ঐ চালকে একবার মাত্র জলে ধুয়ে সিদ্ধ করে ভাত তৈয়ারি করা; (৩) ফেনসমেত ভাত খাওয়া। এরূপ ভাত রান্না করা খুব সহজসাধ্য নয়; কারণ প্রায়ই ফেন-শুদ্ধ ভাত গলে পাঁক হয়ে যায়, কিংবা ডেলা পাকিয়ে যায় ব'লে তা' খেতে ততটা ভালও লাগে না এবং সঙ্গের তরকারির আস্বাদও পাওয়া

যায় না। কিন্তু কিছুদিন চেষ্টা ক'রলেই যাঁরা রান্না করেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে ঠিক কতটুকু জলে কতটুকু চাল দিলে ভাত সুসিদ্ধ হবে, অথচ ফেন গাল্‌বার আবশ্যকতা থাকবে না। চাল সুসিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িতে জল যখন মরে আসবে তখন উনান হতে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে, ঢাকনির দ্বারা মুখবন্ধ অবস্থায় দু'চারবার ঝাঁকানি দিয়ে, তৎপরে ঢাকনি খুলে উনানের পাশে রেখে দিলে ফেনশুদ্ধ ভাতও বেশ ঝর্‌ঝরে হয়ে যায়। যাঁদের বাড়িতে 'ইক্‌মিক কুকার' আছে, তাঁদের পক্ষে বিশেষ কিছুই হাঙ্গামা নেই, কারণ ঐরূপ কুকারের সাহায্যে অনায়াসে পুষ্টিকারিতার অপচয়হীন ভাতের ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয় যদি প্রত্যেক বাড়িতে আতপ চালের পরিবর্ত্তে সিদ্ধ চালের ভাতের ব্যবস্থা হয়; কারণ যখন গোটা ধানকে বাষ্পে সিদ্ধ করা হয় তখন প্রোটীন, ভাইটামিন 'বি,' ফস্‌ফরাস প্রভৃতি যে সকল প্রয়োজনীয় উপাদান ধানের খোসার নীচেই থাকে, তারা চালের গভীরতর অংশে ঢুকে যায় এবং ফলে, কলে ভাল করে ছাঁটলেও ওগুলি খোসার সঙ্গে বাইরে চলে যায় না। ফেন-সমেত সিদ্ধ চালের ভাত রান্না করা সহজ এবং আতপ চালের মত গলে গিয়ে অথবা ডেলা পাকিয়ে তার আস্বাদও নষ্ট হয় না। আবার সিদ্ধ চাল দামেও কতকটা সস্তা, সুতরাং অল্প খরচে অধিকতর পরিপুষ্টির জন্য সিদ্ধ চালই প্রশস্ত। অবশ্য সিদ্ধচালের ভাত হজম হয় একটু দেরীতে। কিন্তু যাদের খেটে খেতে

হয়, অথবা যাদের দশটা-পাঁচটার মধ্যে অন্য কিছু খাওয়ার সুযোগ কিংবা সঙ্গতি নেই, তাদের পক্ষে এই কারণেও সিদ্ধ চালই অধিকতর বাঞ্ছনীয় কি ?

(২) সিদ্ধ মাংসে কাঁচা মাংসের চেয়ে জলীয়ভাগ কম থাকে (পরিপুষ্টি-হিসাবে পাঁচছটাক কাঁচা মাংস প্রায় এক পোয়া সুসিদ্ধ মাংসের সমান)। সিদ্ধ হওয়ার ফলে মাংসের প্রোটীনের তঞ্চন হয়; কলাজেন (collagen) তন্তুগুলির জিলেটিনে (gelatin) রূপান্তর ঘটে ব'লে মাংসের পৃথক্ পৃথক্ তন্তুগুলি একে অন্যের সংস্রব হ'তে আল্গা হয়, কিন্তু স্নেহজাতীয় এবং অন্যান্য নানা উপাদানও কতকটা নষ্ট হয়ে যায়। রান্নাকরা মাংস মুখরোচক এবং তা' চিবিয়ে খাওয়া সহজ ব'লে হজমের খুবই সাহায্য হয়, কিন্তু অতিসিদ্ধ মাংসে প্রোটীন অত্যধিক তঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং অত্যধিক তেল, ঘি এবং মসলাসহযোগে (কালিয়া, কোর্মা, কোপ্তা প্রভৃতিতে) তার সুপাচ্যতাও নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে উপযুক্ত খাদ্যকে অনুপযুক্ত করে তোলা, খাদ্য, শক্তি এবং সময়, সব কিছুরই অপচয় বললে অত্যুক্তি করা হয় না। একই ভাবে ডিম কাঁচা, সিকিসিদ্ধ অথবা আধসিদ্ধ অবস্থায় অতি সুপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য হলেও অতিসিদ্ধ ডিমের, অথবা তাকে ভেজে যখন কালিয়া প্রস্তুত করা হয় তখন তার সুপাচ্যতা আর একেবারেই থাকে না। মাছ, ডিম কিংবা মাংস ভাজা অবস্থায় অতীব দুষ্পাচ্য, সুতরাং এভাবে মূল্যবান্ খাদ্যবস্তুর যাতে অপচয় না ঘটে সুগৃহিণীদের সেদিকে দৃষ্টিরাখা অবশ্য

কর্ত্তব্য। আদা, কাঁচালঙ্কা প্রভৃতি-সহযোগে কোন কোন মাছ পুড়িয়ে খেতে বেশ লাগে ; এতে সময়ও লাগে কম, রান্নারও কোন হাঙ্গামা নেই, অথচ খাদ্য-হিসাবে মাছের গুণটি পুরোপুরি থাকে। ভাতে সিদ্ধ মাছও এ কারণেই পরিপুষ্টির দিক্ হতে বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অত্যধিক তেল ও মসলা-সহযোগে তারও গুণ অনেকটা কমে যায়।

(৩) শাক, লতাপাতা প্রভৃতিও আমাদের খাদ্যের অত্যাবশ্যক উপাদান ; কারণ এগুলি হতে অতি সহজে এবং সুলভে আমরা লৌহ, ভাইটামিন 'বি', ও 'সি' এবং কেরোটিন প্রভৃতি পাই। কুমড়োপাতাশাকে কতকটা ক্যাল্‌সিয়ামও থাকে। কিন্তু রান্নার দোষে প্রায়শঃ ঐ উপাদানগুলির অপচয় ঘটে। প্রধানতঃ এগুলিকে সিদ্ধকরে যে জল ফেলে দেওয়া হয়, তার সঙ্গে অনেকটা পুষ্টিকর বস্তু চলে যায় ; আবার অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ ক'রতে ক'রতে অথবা সেগুলিকে খোলা অবস্থায় বহুক্ষণ ধরে ভাজা করতে গিয়ে ভাইটামিন 'বি', ও 'সি' প্রভৃতি অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। যে জলে তরকারিগুলিকে সিদ্ধ করা হয় তা'দিয়ে 'সূপ' প্রভৃতি করে নিলে অথবা তরকারির সঙ্গে ঐ জলটা যাতে থাকে তার ব্যবস্থা ক'রলে কতকটা পুষ্টিকারিতার অপচয় বন্ধ হয়। আবার ফুটন্ত গরম জলে ছেড়ে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধ করে নিলে, অথবা গরম তেল কিংবা ঘিতে দু' একমিনিট নেড়ে চেড়ে খাওয়ার উপযুক্ত করে নিলে অত্যাবশ্যক উপাদানগুলি অনেকটা অবিকৃত থাকে। টমেটো, লেটুস্-শাক প্রভৃতিকে

একেবারেই সিদ্ধ করা উচিত নয়, যতদূর সম্ভব কাঁচা এবং তা' না হলে ফুটন্ত তেল কিংবা ঘি-তে দু'এক মিনিটের জন্য তা' ছেড়ে দিয়ে উঠিয়ে নিলেই তারা উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হয়। তাতে তাদের নিজস্ব সুবাস এবং ভাইটামিন 'সি' পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। সুতরাং বাঙালী-ঘরে লেটুস্-শাকভাজা, টমেটোর চাটনি প্রভৃতি খাদ্যের পুষ্টিকারিতার অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ পেঁপের আঠায় পেপেন নামক প্রোটীনের যে হজমী এন্‌জাইমটি থাকে তা শক্ত মাংস কিংবা পাকা মাছকে সুসিদ্ধ করতে এমন ভাবে সাহায্য করে যে রান্নার পূর্ব্বে ঐ মাংস বা মাছে পেঁপের আঠা কিছুক্ষণ লাগিয়ে রাখলে তা' সহজেই সিদ্ধ ও পরিপাক-যোগ্য হয়। কাঁচা পেঁপেকে সিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ এন্‌জাইমটি নষ্ট হ'য়ে যায়।

(৪) আলু প্রভৃতিতে খোসার সঙ্গেই পুষ্টিকর ধাতব লবণগুলি থাকে। খোসা ছাড়িয়ে রান্না ক'রলে ওগুলির অপব্যয় হয়, সুতরাং খোসাশুদ্ধ আলু তরকারি অথবা ভাতে ছেড়ে দিয়ে খাওয়ার বেলা খোসা ছাড়িয়ে নিলেই ঐ অপচয় অনায়াসে বন্ধ করা যায়।

(৫) এক বলকা জ্বাল দেওয়া দুধের নিজস্ব সুবাস এবং ভাইটামিনগুলি যেরূপ অবিকৃত থাকে, বারবার জ্বাল দেওয়া দুধে সেগুলি কখনই সেরূপ থাকে না; সুতরাং এক বলকা দুধই কি শিশু, কি রোগী সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য।

(৬) পাঁপর প্রভৃতি সেঁকে খেলে হজম করা খুবই সহজ

কিন্তু তেলে কিংবা ঘিতে কড়া করে ভেজে খেলে প্রায়ই তা' দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে।

(৭) ঝুনো নারিকেলের শাঁস একটি উপাদেয় ও মূল্যবান্ খাদ্য। নিরামিষ তবকারিতে নারিকেল-গুঁড়ো, মালাই কারিতে নারিকেলের দুধ; বিস্কুট প্রভৃতিতে নারিকেলের গুঁড়ো এবং সদ্যপ্রস্তুত নারিকেল তেল অথবা তা হ'তে প্রস্তুত কোকোজেম প্রভৃতি খাদ্য-হিসাবে মূল্যবান্ এবং উপাদেয়ও বটে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ নারিকেলের ডাব-রূপে অপচয় রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্র দেখা যায়। সামান্য একটু জলের জন্য এরূপ মূল্যবান্ একটি খাদ্যবস্তু এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় নানা ব্যবহার্য্য বস্তুর উপাদান ছিবড়েকেও এরূপ ভাবে নষ্ট করা অত্যন্ত অন্যায়।

আমাদের অজ্ঞতা এবং অসতর্কতার ফলে প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির এরূপ অপচয় অসংখ্য স্থলেই নিত্য ঘট্‌ছে; অথচ খাদ্যাভাব সত্ত্বেও আমরা এ সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নই। ইংলণ্ডে রান্নার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় খাদ্যের অপচয়ের সাধারণ পরিমাণ, শতকরা দশভাগ ব'লে ধরে নেওয়া হয়। যেদেশে রান্নার প্রণালী এবং তার জন্য আবশ্যক সময় অতি সংক্ষিপ্ত, সেখানে যদি খাদ্যের এক দশমাংশের অপচয় হয়, তা'হলে বাঙালীর ঘরে ঘরে নিত্য রাজসিক আহারের তালিকায় (যার জন্য গৃহলক্ষ্মীদের সারাদিনই ব্যয়িত হয়) যে অপচয় অনেক বেশী হয়, তাতে আর সন্দেহ কি? এই দুর্দ্দিনে অর্থাৎ খাদ্য যখন

দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মোটেই সুলভ নয়, তখন আমাদের অবহেলার জন্য যদি বিন্দুমাত্রও অস্বাভাবিক অপচয় ঘটে, তাহ'লে তাকে পাপ ব'লে গণ্য করাই উচিত। এটা বন্ধ ক'রতে পারেন একমাত্র সুগৃহিণী বঙ্গলক্ষ্মীরা, তাই তাঁদের নিকট আমার এই সনির্ব্বন্ধ আবেদন।

আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, যে খাদ্য খেয়ে আমরা জীবন ধারণ করি, তাকে উপযুক্ত রান্নার দ্বারা দেহের উপযোগী করে নেওয়া একটা কুশল বৈজ্ঞানিক কার্য্য। সুতরাং এই হিসাবে আমাদের অন্নপূর্ণা বঙ্গনারীরা রান্নাঘর-নামক গবেষণাগারের 'মাদাম কুরী'। কতটুকু উত্তাপে, কোন্ কোন্ উপাদানের সাহায্যে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্য বস্তু সকলের সেরা উপাদেয় ও উপকারী আহার্য্যে পবিণত হবে, কোন্ কোন্ উদ্ভিদ্ অথবা কোন্ কোন্ প্রাণী হবে ঐরূপ গবেষণার বিষয়বস্তু, কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ের হবে তাতে সন্তোষ-বিধান এবং দেহের কোন্ অংশের হবে পরিপুষ্টি, যথাস্থলে তাদের যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ, নির্ব্বাচন কিংবা সংঘটন সম্পূর্ণ নির্ভর করে একমাত্র তাঁদেরই কর্ম্মকুশলতার উপর। স্বর্গতা মাদাম কুরীর পরীক্ষালব্ধ গবেষণা-ফল আজ সারা দুনিয়া যেমন ভোগ করছে, আমাদের প্রতি-গৃহের 'মাদাম কুরী'র কুশলহস্তের ফলও আমরা তেমনি রোজই খুশী হয়ে উপভোগ ক'রছি; অথচ ভুলেও আমরা তাকে ঋণ ব'লে মনে করি না, যেন সেটা আমাদের প্রাপ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। খেতে বসে কোন কিছু ভাল হয়েছে ব'ললেই আর রক্ষা নেই, তখনই

আমাদের পাতে এসে পড়বেই পড়বে "সিংহের অংশ" ; ফলে অন্নপূর্ণার নিজের ভাগে জুট্‌বে শূন্য। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাওয়া এবং খাওয়ানো, সেও তো আর এক রকমের অপচয়। সুতরাং বাঙালীর সংসারে যেদিকে তাকাই, শুধুই অপচয়। অন্নপূর্ণা বঙ্গনারী 'মাদাম কুরী'দের আন্তরিক এবং সমবেত প্রচেষ্টায় বাঙালীর কলঙ্ক এরূপ অপচয়ের বাহুল্য যত শীঘ্র দূর হয়, ততই মঙ্গল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কট

বাঙালীর খাদ্য-সমস্যা একটি চিরন্তন সমস্যা। ব্রিটিশ-শোষণ এবং শাসনের প্রথম অবস্থা হ'তে ব্রিটিশ-শৃঙ্খল-মুক্তির কাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশের বুকের উপর প্রকৃতির খেয়ালে এবং বিদেশী শাসকের খুসীমত যে সকল ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাত বার বার নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম ভাবে ব'য়ে গিয়েছে, আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য এবং পরিপুষ্টির দৈন্য তাদের অন্যতম। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হ'তে আরম্ভ করে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও অতিবৃষ্টি, বন্যাপ্লাবন কিংবা অনাবৃষ্টিজনিত অজন্মা অথবা ছোট খাটো দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। তার উপর অসুখ-বিসুখ, পরিপুষ্টির অভাবে কার্য্যক্ষমতার অভাব ও অলসতার ফলে কিংবা অতিরিক্ত পরিমাণে ভাগ্য-বিশ্বাসী ব'লে বাঙালী জাতি কখনও যে অত্যাবশ্যক এই সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়েছে এমন মনে হয় না। বাংলা মায়ের পূর্ব্বাঞ্চলে অনায়াসে অথবা অল্পায়াসে যেটুকু সোনার ফসল প্রকৃতির দয়ায় ফলেছে তাতেই সেখানের লোকেরা হয়েছে আলস্য-প্রবণ, কলহ-প্রিয় এবং মামলাবাজ, কিন্তু অপরদিকে পশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটিশ-শাসন ও শোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সভ্যতা-প্রসারের অঙ্গরূপে রেলওয়ে প্রভৃতির কল্যাণে (?)

ভাগীরথী এবং তার শাখা, প্রশাখা ও উপশাখার স্বাভাবিক জল-স্রোত প্রতিহত অথবা রুদ্ধ হওয়ার ফলে এককালের উর্ব্বর ভূমি আজ অনুর্ব্বর এবং ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি মশা ও মাছি-সংক্রামিত বহু রোগের আবাসস্থল হ'য়ে তত্রত্য লোককে নিয়ত অকর্ম্মণ্য, শ্রম-অপারগ এবং নির্ম্মম অদৃষ্টের হাতের ক্রীড়নক করে তুলেছে। বাঙালী জাতি যদি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং 'অনাগত-বিধাতা' কিংবা 'প্রত্যুৎপন্নমতি'র মত সচেষ্ট এবং তৎপর হ'ত, তাহলে কখনই তাকে আজকের মত চরম দুর্দ্দশার প্রান্তে এসে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এরূপ উৎকণ্ঠার সঙ্গে অথবা জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকতে হ'ত না। গরুকে ভাল খাওয়ালে গরু ভাল দুধ দেয়, একথা সকলেই জানে; কিন্তু জন্মভূমি বাংলার 'মাটি'রও যে উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন আছে বাঙালী অজ্ঞতাবশে সেটা সম্যক্ উপলব্ধি ক'রতে না পেরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা অনশনক্লিষ্টা রোগজীর্ণা শীর্ণকায়া জননীর স্তন্যের উপর নির্ভরশীল রুগ্ন পুত্রের যা ভবিতব্য তাই বরণ করে প্রায় সর্ব্বনাশের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালী মার বুক হতে স্তন্যের মত ফসলের সম্ভার টেনে এনেছে, অথচ বিনিময়ে তাঁকে কোনও রূপ সার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি; মার বুক যখন জলের অভাবে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে তখনও খাল কেটে নদী হতে কিংবা পুকুর কিংবা কুয়ো হতেও উপযুক্ত পরিমাণে জলের ব্যবস্থা করে নি তাঁর জন্য। আজ যদি জননী তার

ফলে সন্তানকে সুমিষ্ট স্তন্যরসে বঞ্চিত করেন, সে দোষ জননীব নয়, সে দোষ বিধাতারও নয়, সে দোষ ষোল আনাই অজ্ঞ, অলস এবং শ্রমবিমুখ সন্তানের।

'মাছে-ভাতে বাঙালী'; সুতরাং ভাতের পরেই মাছের স্থান বাঙালীর খাদ্যে। এই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যাংশের অভাবের জন্যও বাঙালীরা নিজেরাই দায়ী। নদী, খাল, বিল, পুকুর বহুদিন বাঙালীকে পরিপুষ্টি জুগিয়ে এসেছে এবং বাঙালী চোখ-কান বুজে স্বার্থপরের মত তার প্রয়োজনটুকুই আহরণ কবে নিয়েছে, কিন্তু শৃঙ্খলামত মাছের চাষ করে তার বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রবার যে প্রয়োজন আছে, কখনও তার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করেনি। বাংলা মায়ের পদতলে পড়ে বিশাল সমুদ্র, আর সমুদ্রে মাছের অভাবও নেই; কিন্তু বাঙালী কখনও এই বিরাট ভাণ্ডার হতে নিজের জন্য খাদ্য-সংগ্রহ ক'রতে চেষ্টা করে নি। ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি যে সকল দ্বৈপিক দেশে কৃষিজাত খাদ্যের অভাব, সে সকল দেশে সমুদ্র জোগায় পরিপুষ্টির একটা বৃহৎ অংশ। ইংরেজ এবং জাপানী মৎস্য-জীবীরা বিপদকে তুচ্ছ করে নিয়ত ছুটে যায় উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সিন্ধুবুকে, আর যখন পুনরায় ফিরে আসে মাটির দেশে, সঙ্গে নিয়ে আসে রজত-শুভ্র খাদ্য-সম্ভার। কিন্তু কোথায় বাঙালী! "একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়, একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়", ঐতিহ্যের সেই পুরাতন রূপকথা শুনে

শিশুরা যেমন ঘুমিয়ে পড়ে, আমরাও কি তেমনি ঘুমিয়ে নেই ? বুকের উপর দিয়ে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' তীব্র আঘাত হেনে গেল এবং লাখ-লাখ লোক অনাহারে মরে মরণ-যন্ত্রণার হাত হতে রেহাই পেল। না খেয়ে, কখনো বা আধপেটা খেয়ে, 'একটু ফ্যান দাও মা' ব'লে সহরের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে যারা অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলে গেছে, তাদেরই মত 'একটু চাল, একটু আটা ভিক্ষে দাও' বলে আজ অষ্ট্রেলিয়া, কাল কানাডা এবং পরশু ব্রেজিলের পানে ভিক্ষার পাত্র হাতে এখনও আমরা কাতর আবেদন জানাচ্ছি। অবশ্য তফাৎ এই যে, আমরা নিজেরা ভিক্ষে করতে যাচ্ছি নে, আমাদের হয়ে তা' কচ্ছেন আমাদের মুখপাত্ররূপে আমাদের খাদ্য-সচিব। যখন কিছু ভিক্ষের চাল জুটছে, তখন সপ্তাহে রেশনের চালের বরাদ্দ হচ্ছে একসের ছ' ছটাক চাল আবার যখন জুটছে না, তখন বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে একসের পাঁচ ছটাক। একই ভাবে গম কিংবা আটা জুটলে বরাদ্দ হচ্ছে তিন পোয়া, না হলে নামছে দশ ছটাকে। কিন্তু এটুকুরই জন্য 'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত,' তবু আমাদের হুঁস নেই। অথচ যন্ত্রচালিত লাঙ্গলের ব্যবহারে ছ'মাসের মধ্যে ফসলের পরিমাণ অতি স্বল্পায়াসে দ্বিগুণ হতে তিনগুণ পর্য্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে এবং যন্ত্রচালিত ট্রলার নৌকার সাহায্যে সমুদ্র হ'তে প্রয়োজনাতিরিক্ত মৎস্যের ব্যবস্থাও এদেশে হ'তে পারে তা' মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী হ'তে আরম্ভ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে ? কিন্তু 'বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে ?' এখানেও

সেই চিরন্তন প্রশ্ন। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ, বিজ্ঞদের উপদেশ, বিজ্ঞানীদের নির্দ্দেশ এবং কর্ম্মকর্ত্তাদের তৎপরতা, সকলই রাইটার্স বিল্ডিংস্এ লাল ফিতে-বাঁধা ফাইলের মধ্যে আবদ্ধ। ফাইলগুলি তাঁতীর তকলীর মত স্বাস্থ্য-দপ্তর হ'তে খাদ্য-দপ্তরে, খাদ্য-দপ্তব হ'তে কৃষি-দপ্তরে, কৃষি-দপ্তর হ'তে বন ও মৎস্যচাষ-দপ্তরে এবং সকল দপ্তর হ'তে অর্থ-দপ্তরে এবং পর্য্যায়ক্রমে অর্থ-দপ্তর হ'তে পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে আনাগোনা ক'রতে ক'রতে স্ফীতকায় হয় এবং স্বীয় পরিপুষ্টি যথেষ্টই লাভ করে বটে, কিন্তু জন-সাধারণের ভাগ্যের কিংবা দুর্গতি অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

সমালোচনার উত্তরে গবর্ণমেণ্ট হয়ত বলবেন যে, অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বর করে ফসল বাড়াবার ও দেশের শিল্প ও উৎপাদন-ক্ষমতা প্রভৃতি আর্থিক উন্নতির জন্য তাঁরা ইতি-মধ্যেই দামোদর-বাঁধ, হীরাকুণ্ড-বাঁধ প্রভৃতি বিরাট্ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করেছেন, দেশের খাদ্যের ঘাটতি পূরণের জন্য নানা দেশ-দেশান্তব হতে গম, চাল প্রভৃতি আমদানির ব্যবস্থা করছেন এবং দেশে ও নানাস্থানে রেশন প্রবর্ত্তনের দ্বারা জনসাধারণের জন্য খাদ্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রছেন। এক রকম স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যে এই সকল সুদূর-প্রসারী বিরাট্ পরিকল্পনাগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে তা' অত্যন্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যে খাদ্যসঙ্কটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি সে অবস্থায় এসকল পরিকল্পনার সুদূর সাফল্যের ফল মরুভূমিতে মরীচিকার মতই। আমরা জানি

চিত্র ২. যন্ত্রচালিত লাঙ্গল বা ট্রাক্টর
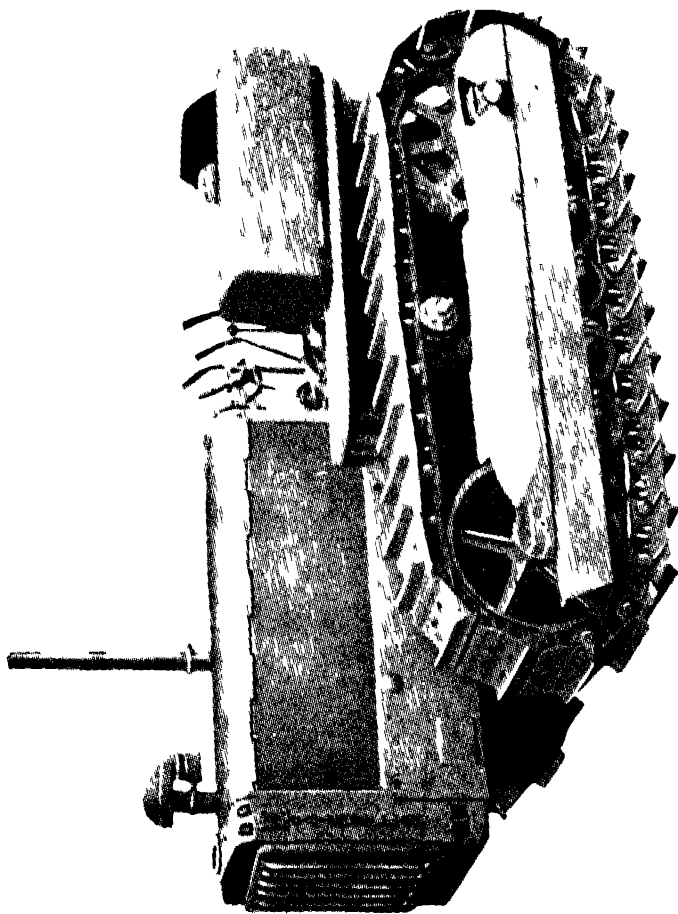
শক্করে সিন্ধুনদের বাঁধ নির্ম্মাণের ফলে সিন্ধুপ্রদেশে হাজার হাজার মাইলব্যাপী উষর মরুভূমি আজ শস্যশ্যামল হয়ে এক বিপুল খাদ্য-ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ ঐরূপ সাফল্যের আশায় আশান্বিত হয়েই গবর্ণমেণ্ট দামোদর-ভ্যালি-পরিকল্পনার কার্য্যকরী সমিতিতে একজন খাদ্য-বিশেষজ্ঞও নিযুক্ত করেছেন, ঠিক রামের জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণের সূচনার মতই। জঠরে হুতাশন নিয়ে ততদিন কি লোক গ্রীষ্মে চাতক পাখীর মত বর্ষার প্রথম বারিবিন্দুর অপেক্ষায় তৃষ্ণার্ত্তপ্রাণে বেঁচে থাকবে? সুতরাং অনতিবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের কোনও স্বল্পকালে ফলদায়ক পরিকল্পনার সাহায্যে লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যন্ত্রচালিত লাঙ্গলের (চিত্র, ৪) সাহায্যে স্বল্পায়াসে যা'তে দেশের কৃষিযোগ্য প্রত্যেক ভূমিখণ্ড সত্বর বীজবপনের যোগ্য হয় গবর্ণমেণ্টের এবং জন-সাধারণের একযোগে সেই চেষ্টা করা উচিত। সমবায়-পদ্ধতিতে কয়েকটি গ্রামের লোক মিলিত হ'য়ে এবং গবর্ণমেণ্টের আংশিক সাহায্যে চেষ্টা করলে এতে অল্পকালের মধ্যেই অনেকটা সাফল্য অর্জ্জন করা যেতে পারে। যে সকল ভূমিতে ফসলের পরিমাণ ক্রমশঃই কমে আসছে, সম্ভব হলে রাসায়নিক সারের দ্বারা তাদের উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াতে হবে, অন্যথায় সহজলভ্য এবং স্বাভাবিক সার গোবরের সাহায্যে ভূমির উর্ব্বরতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। ঘুঁটে প্রভৃতি প্রস্তুত করে গোবরের যে অপচয় করা হয়, তা বন্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। আবশ্যক হ'লে এই বিষয়ে আইনের

সাহায্যে লওয়াও বাঞ্ছনীয়। আশু-ফলদায়ক ব্যবস্থা উপেক্ষা করে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সাফল্যের প্রতীক্ষায় থাকলে বর্ত্তমানে অর্দ্ধাশন কিংবা অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের কত জন বেঁচে থেকে সে সুফল ভোগ করবেন, তা ভগবান্‌ই জানেন।

দ্বিতীয়তঃ নানা দেশদেশান্তর হতে খাদ্যাহরণ-ব্যবস্থার জন্য যদিও আজ আমরা কোনও উপায়ে টিকে আছি, তবুও এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট একটি সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে কাজ কচ্ছেন বলে মনে হয় না। হয়ত বা পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, আলোড়ন, খাদ্যাভাব এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্যই তাঁদের প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করছে না, তাই আজ ব্রেজিল, কাল আর্জেন্টিনা, পরশু কানাডা প্রভৃতি খাদ্য-স্বচ্ছল দেশের সঙ্গে অনবরত পরিবর্ত্তনশীল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এগোতে হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া আজ পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্য-বাদের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে নবলব্ধ স্বাধীনতার অরুণালোকে নিজেদের ভাগ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, সিংহল, চীন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া সকলেই আজ বুঝতে পেরেছে যে বাঁচার মত বেঁচে থাকতে হলে চাই পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতি। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সমগোষ্ঠীয় না হলেও সমভৌগোলিক অবস্থানে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ব'লে তারাও আজ প্রতিবেশীদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত ক'রতে ব্যগ্র। তাই ইন্দোনেশিয়ার

সঙ্কটে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে আজ যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী সকলকে "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" সাদর আহ্বান জানিয়েছেন তখন শুধু তারাই নহে, মধ্যপ্রাচ্যের আরব, মিশর, পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্থান প্রভৃতিও মিলনের মহাক্ষেত্রে এক উদ্দেশ্যে ও এক লক্ষ্যে সমবেত হয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থনৈতিক কারণে আর একটি সম্মেলনে তারা সকলেই সমবেত হয়েছিল। সুতরাং পারস্পরিক সহযোগে বাঁচার মত বেঁচে থেকে জগৎসভায় একযোগে বিশিষ্ট আসন-লাভের জন্য সকলেরই আগ্রহ ও চেষ্টা আছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ধানের ফসল হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় গম প্রচুর জন্মে এবং নিউজিল্যাণ্ডে দুধ ও তজ্জাত খাদ্যাদি প্রচুর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিপুল লোকসংখ্যার তুলনায় বর্ত্তমানে খাদ্যসম্ভার যখন অপ্রচুর তখন ভারতবর্ষজাত নানা পণ্যের িনিময়ে ঐ সকল দেশ হতে খাদ্যবস্তু-আমদানির একটা পাকা ন্দাবস্ত করে নিলে অনিশ্চয়তার হাত হতে যেমন বাঁচা ২য়, তেমনি সুদূর আমেরিকার দেশসমূহ হতে প্রশান্ত মহা-সাগর পার হ'য়ে খাদ্যবস্তু নিয়ে আসার অসুবিধা ও সময়ও অনেকটা সংক্ষিপ্ত করে তোলা যায়। দূর-দূরান্তরের অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে 'নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা'র চেয়ে অদূরবর্ত্তী প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সাংবৎসরিক কিংবা ষাণ্মাষিক একটা পাকা বন্দোবস্ত সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ।

তারপরেই আসছে রেশনের কথা। কিন্তু যে ভাবে

এদেশে রেশন-প্রথার প্রবর্ত্তন হয়েছে তা লোক-দেখানো একটা গোঁজামিল ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই 'কুইট-ইণ্ডিয়া'-রত হোমরা-চোমরা, ছোট-বড়-মাঝারি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঝানু রক্ষকদের সঙ্গে একই জাহাজে বিলাতে যাই। যুদ্ধোত্তর বিলাতে একটি বিষয়ে খুবই আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করেছিলুম, সেটি হচ্ছে তাদের সর্ব্বাংশে সাফল্য-মণ্ডিত রেশন-প্রথা। ইংলণ্ড চিরকালই খাদ্য-হিসাবে একটি ঘাটতি দেশ। স্বাভাবিক সময়েও ইংলণ্ডে গম আসে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হতে, মাংস আসে অষ্ট্রেলিয়া কিংবা আয়র্লণ্ড হতে, দুগ্ধজ দ্রব্যাদি আসে নিউজিল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড কিংবা ডেনমার্ক হতে, চিনি আসে মরিসাস কিংবা কিউবা হতে, ফলমূল আসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, স্পেন অথবা ইটালী হতে, আলু ও ডিম আসে আয়র্লণ্ড হতে, এককথায় ইংলণ্ডে সামুদ্রিক মাছ এবং বেরি-জাতীয় নানাপ্রকারের ফল এবং পীচ, প্লুম প্রভৃতি আরও দু'এক জাতীয় ফল ও অল্প আলু ছাড়া অন্য সকল প্রকার খাদ্যেরই অভাব। দ্বিতীয় মহাসমরে লিপ্ত হয়ে ইংলণ্ডের খাদ্যসঙ্কট একেবারে চরম হয়ে উঠেছিল, কেননা অক্ষ-শক্তির সাব্‌মেরিনগুলির দৌরাত্ম্যে বহিরাগত খাদ্যের আমদানি প্রয়োজনের তুলনায় এত কম হচ্ছিল যে ইংলণ্ডের পক্ষে যথাসময়ে কঠোর রেশন-প্রথা প্রবর্ত্তন না করলে হয়ত খাদ্যাভাবেই শেষ পর্য্যন্ত তাকে জার্ম্মাণীর নিকটে যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ফ্রান্সের মতই আত্মসমর্পণ করতে হ'ত।

কিন্তু ইংরেজের দেশাত্ম-বোধ, আত্মপ্রত্যয় এবং শৃঙ্খলানুরক্তি এত বেশী যে তারা হারতে হারতেও পর পর দু'টি মহাসমরে বিজয়ীর গৌরব-মুকুটে ভূষিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের রেশন-প্রথা গবর্ণমেণ্টের জনপ্রীতির এবং একই সঙ্গে জনসাধারণের নিয়মানুবর্ত্তিতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কঠোর রেশন-প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে ইংলণ্ডের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, এ কথাটা যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রিটিশের ভুয়া এবং মিথ্যা প্রচার বলে মনে হ'ত; কিন্তু সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এবং নিজের কানে শুনে মনে হ'ল যে, কথাটি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। কঠোর রেশনের চাপে জনসাধারণ যে সন্তুষ্ট ছিল এমন নয়, বরং আমরা ইংলণ্ডে থাকাকালে রেশন-বহির্ভূত আলু পর্য্যন্ত রেশনের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে এবং ফলে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে বিরোধী, এমন কি স্বপক্ষীয় সদস্যদেরও প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে কমন্স সভায় বিতর্ক-কালে উভয় পক্ষের মতামত বিশেষভাবে জানবার এবং বুঝবার সুযোগও লাভ করেছিলুম। আপাত-দৃষ্টিতে কঠোর রেশন-প্রথায় লোকের স্বাস্থ্য কিরূপ ভাল থাকতে পারে আমাদের দেশে ঐ নামীয় প্রথার চাপে পিষ্ট নরনারীর পক্ষে বুঝে উঠা শক্ত; কারণ রেশন-প্রথার আসল উদ্দেশ্য যদিও অপ্রচুর খাদ্যের দ্বারা দেশের লোকের খাদ্য-সংস্থানের ব্যবস্থা, তা'হলেও তার যে আর একটা কল্যাণকর দিক্ আছে সাধারণতঃ তা' বড় একটা নজরে পড়ে না। গরীব

যারা তাদের স্বাস্থ্যহানি হয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ; আর ধনী যারা প্রায়শঃ তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় অমিতাহারে এবং গুরুভোজনে। একসঙ্গে দু'সের খাসীর মাংস অথবা কুড়িটি ডিম কিংবা চল্লিশটি বড় রসগোল্লা খেয়ে, সাধ করে অসুস্থতা বরণ করেছে, এমন রোগীরও চিকিৎসার জন্য ডাক পড়েছে। বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রলে বুঝতে পারা যায় যে ইংলণ্ডের রেশন-প্রথা সত্যই ক্রুটিহীন এবং কল্যাণপ্রদ। সেখানে একদিকে গবর্ণমেণ্টের সংগ্রহের পরিমাণ এবং অপরদিকে রেশন-ব্যবস্থায় বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে লোককে কখনই শুনতে হয় না যে 'আজ চাল নেই, কাল রুটি নেই সুতরাং বরাদ্দ পাওয়া যাবে না।' সেদেশে দুধের স্বল্পতার জন্য কেবল শিশু, গর্ভিণী, স্তন্যদাত্রী জননী কিংবা বিশেষ বিশেষ রোগে অসুস্থ ব্যক্তিই দুধের রেশনের অধিকারী এবং কেবল চায়ের জন্য যেটুকু দুধ আবশ্যক তা' ছাড়া বিন্দুমাত্র দুধ সুস্থ বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রাপ্য নয়। যারা দুধ পাবার অধিকারী তারা তা' অতি অল্পমূল্যে অথচ খাঁটিই পায়, আমাদের দেশের মত অর্দ্ধেক দুধে অর্দ্ধেক জল-সহ টাকায় সের দরে তা' বিক্রি হয় না ; তা' ছাড়া যাদের এটুকু ন্যায্য মূল্য দেবারও ক্ষমতা নেই তাদের ডাক্তার, নার্স কিংবা স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের সুপারিশমত বিনামূল্যেই দুধ দেওয়া হয়। ডিম-সম্বন্ধেও প্রায় একইরূপ ব্যবস্থা ; সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তির জন্য প্রতি সপ্তাহে যখন একটি মাত্র ডিমের বরাদ্দ, তখন শিশু, জননী ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে সপ্তাহে সাতটা

পর্য্যন্ত ডিমের ব্যবস্থা আছে, অথচ তার দামও বেশী নয়। এর ফলে সেদেশের জননী এবং ভবিষ্যতের আশা-ভরসা শিশুদের এবং রুগ্ন ব্যক্তিদেরও যে স্বাস্থ্যোন্নতি হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? জনসাধারণের জন্য যে পরিমাণে রুটি, বা অন্যান্য গমজাত খাদ্যের বরাদ্দ আছে, তা' প্রচুর না হলেও পর্য্যাপ্ত বটে। তা'ছাড়া 'সর্ব্বত্র ফসল বাড়াও' এই প্রচারের ফলে যেটুকু জমি যেখানে আছে, এমন কি রান্না-ঘরের আনাচ-কানাচের জমিটুকুতেও আলুর চাষের ফলে লোকে আলু হতে বেশ কিছু প্রোটীন পায়। দেহক্ষয় পরিপূরণের জন্য আলুর প্রোটীন উঁচু দরের ব'লে এবং সামুদ্রিক মাছ রেশন আওতার বাইরে অথচ স্বল্পমূল্য থাকাতে মাংসের বরাদ্দের পবিমাণ কম হ'লেও তাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনও কারণই নেই। তারপর মাখন, পনীর, চিনি, প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যও বরাদ্দের কল্যাণে অল্প পরিমাণে হলেও ন্যায্য মূল্যেই সকলে পায়। ফলমূল, তরি-তরকারি বরাদ্দের গণ্ডীর বাইরে এবং দামও তাদের খুবই বেশী ব'লে দুঃস্থ জনসাধারণ প্রায়শঃ সেগুলি কিনতে পারে না; তা-সত্ত্বেও তদ্দেশীয় বেরিজাতীয় ফল এবং এক প্রকারের টক আপেল সস্তায় পাওয়া যায় এবং জনসাধারণ সেগুলির দ্বারাই ফলমূলের প্রয়োজন মেটায়। লোকের যতই পয়সা থাকুক না কেন বরাদ্দের বাইরে বিন্দুমাত্র দ্রব্য পাওয়া যায় না—অর্থাৎ খাদ্য-সম্বন্ধে কালোবাজার সে দেশের কোথাও নেই। ফলে, যে সকল লোক পূর্ব্বে যদৃচ্ছা টাকা খরচ

করে ঘি, মাখন, পনীর, মাংস, কেক, পুডিং, ক্রীম প্রভৃতি উচ্চ-ক্যালরি সম্পন্ন চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় গ্রহণ করে অজীর্ণরোগ, যকৃৎ-রোগ, বৃক্করোগ, মধুমেহ, গেঁটেবাত, মেদবাহুল্য প্রভৃতি রোগে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়তো, কঠোর রেশন-প্রথার কল্যাণে আজ ঐ সকল রোগে রুগ্ন ব্যক্তির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। অপর পক্ষে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে মাখন, ক্রীম, পনীর প্রভৃতি কিনে খাওয়া সম্ভবপর হ'ত না, রেশনের ধরাবাঁধা নিয়মে আজ তারা পরিমাণে অল্প হলেও ঐ সকল পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পাচ্ছে; ফলে তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সুতরাং এতবড় একটা সঙ্কটের মধ্যেও কঠোর বরাদ্দ-প্রথায় লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি হ'তে দেখে সে দেশের স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞগণ যুদ্ধোত্তরকালে সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরে আসবে তখনও কতকটা শিথিলভাবে এই কল্যাণপ্রদ রেশনপ্রথাকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত কিনা, এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করছেন।

ইংলণ্ডের রেশন-প্রথার সঙ্গে তুলনায় আমাদের দেশের রেশন-প্রথা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিকে গবর্ণমেন্টের সংগ্রহশক্তির অভাব, অপর দিকে কালোবাজারের ছড়াছড়ি এবং মাঝখানে মুনাফাখোর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হ'তে আরম্ভ ক'রে তথাকথিত লোকসেবক (?) নেতাদের অসাধুতার পাপচক্রে, লোকে রেশন-বরাদ্দের প্রহসনের আঘাতে জর্জ্জরিত ও মৃতপ্রায়। কলিকাতা, হাওড়া প্রভৃতি যে সকল

শহরে রেশনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তারই বাইরে রেশন বরাদ্দের চেয়ে অনেক কম দামে চাল, আটা ও গম পাওয়া যায়। জনপ্রতি বরাদ্দের পরিমাণ হাস্যকরভাবে অপ্রচুর, তা' খেয়ে স্বাস্থ্য অটুট রাখা দূরে থাকুক, জীবনধারণ করা পর্য্যন্ত চলে না। তার উপর অনেক সময়েই রেশন আনতে গিয়ে লোককে শুনতে হয় যে আজ চাল আসে নি, কাল আটা নেই, সুতরাং রেশন পাওয়া যাবে না। অথবা পাওয়া গেলেও সময়ে সময়ে যে বস্তু পাওয়া যায় তা' বিকৃত, ভেজাল অথবা অন্য কারণেও মোটেই খাদ্য-নামের যোগ্য নয়, এবং তা গ্রহণে রোগ অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অবস্থায় দোষ গবর্ণমেণ্টের, উৎপাদকের না বণ্টনকারী রেশন-দোকানগুলির তা' নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, যা'দের নিকট হ'তে তা' পাওয়া গিয়েছে, তারা কিংবা রেশনের দোকানগুলি যদি ভেজাল মেশায়, তা' হলে তাঁরা কি করবেন ? বণ্টনকারী রেশন-দোকানের মালিকেরা বলেন "আপনারা গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করুন, অথবা ইচ্ছা হয় নিন না হয় না নিন, আমাদের কি ?" যারা অক্ষম এবং অপারগ তারা ঐ অখাদ্য এবং কুখাদ্যগুলি পয়সা দিয়ে কিনে নিতে বাধ্য হয় ; কিন্তু যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা তখনই মোটরগাড়ী নিয়ে ঢাকুরিয়া, যাদবপুর কিংবা ডায়মণ্ড হারবারের পথে খাদ্য-সংগ্রহের জন্য যাত্রা করেন। যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় লোক পাঠিয়ে রেশন এলাকার বাহির হ'তে না হয় পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা যখন দলে দলে প্রত্যেকে অল্প পরিমাণ

চাল নিয়ে বেচতে আসে, তখন রেশনের নির্দ্দিষ্ট দামের দ্বিগুণ দামে চাল সংগ্রহ ক'রে খাদ্যের অভাব পূরণ করেন।

সরষের তেল পূর্ব্বে রেশনের গণ্ডীতে ছিল; কি ভাবে উৎপাদক এবং কালোবাজারীদের ষড়যন্ত্রে তার বরাদ্দ বান্‌চাল হয়েছিল এখনো লোকে তা ভোলে নি এবং আট-দশ আনা সেরের পরিবর্ত্তে আজ তাই আড়াই টাকা সের দরে কিনে লোকে গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করছে। চিনি-সম্বন্ধেও প্রায় একই ব্যাপার। অদূরদর্শী গবর্ণমেণ্ট মনে করলেন যে, যখন প্রচুর চিনি পাওয়া যায়, তখন বরাদ্দ-প্রথা তুলে দিলে দেশে বাজার-দর নিশ্চয়ই কম্‌বে। কিন্তু "উল্টো বুঝ্‌লি রাম" হয়ে গেল! মিলগুলি এবং মুনাফাখোরেরা আবার নিজ নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুযোগ পেল। রেশন-প্রথায় যে চিনির দর ছিল, দশ আনা প্রতিসের, তাই এক লাফে এক টাকা সেরদরের আভিজাত্য লাভ ক'রলে। সুতরাং এদেশের বর্ত্তমান রেশন-প্রথা একটা নিছক ভণ্ডামি অথবা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। রেশনের মূল উদ্দেশ্য ধনী ও দরিদ্রকে একস্তরে এনে উভয়েরই উপকার সাধন করা, কিন্তু এ ভাবে ইতস্ততঃ আংশিক এবং শিথিল রেশন-প্রথা-প্রবর্ত্তনে লাভ ত কারো হয়ই না, বরং গরীবকে অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত রেখে তার কার্য্যক্ষমতাকে সম্পুর্ণ বা আংশিকভাবে কেড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। রেশনের কল্যাণে সুলভ্য প্রাপ্য হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং চড়াদরে ব্ল্যাক মার্কেটে কিনে খাওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। আর রেশনের আওতার

বাইরে যে সকল খাদ্যবস্তু, যেমন দুধ, ঘি, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম, তরি-তরকারি, সরষের তেল, দাল কিংবা চিনি পাওয়া যায়, ঐগুলির দাম কমপক্ষে চারগুণ এবং কোন কোন স্থলে আট গুণ পর্য্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে সেগুলি ক্রয় করা সাধ্যাতীত। কেবল প্রভূত ধনশালী ব্যক্তিরা এবং যুদ্ধের সময় মিলিটারী কণ্ট্রাক্টে এবং বর্ত্তমানে কালোবাজারের দয়ায় যারা 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়েছে তারা ছাড়া গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণী দূরে থাকুক উচ্চমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর পক্ষেও ঐ পুষ্টিকর খাদ্যগুলি অতি অল্পই গ্রহণ করা সম্ভব। আজকাল প্রতি গৃহস্থপরিবারেব খাদ্যে দেহ-পুষ্টিকারক প্রোটীন, ধাতবলবণ এবং ভাইটামিনগুলির পরিমাণ দেহরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনের এক চতুর্থাংশও পূরণ করতে পারে কিনা সন্দেহ। চাল, আটা, ময়দা প্রভৃতির পরিমাণও প্রয়োজনের অনুপাতে অপ্রচুর, সুতরাং দৈনন্দিন অত্যাবশ্যক সর্ব্বনিম্ন ক্যালরির প্রয়োজন তাতে মিট্‌তে পারে না ব'লে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা দুইই প্রতিদিন কমে যাচ্ছে। এই পাপচক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে বাঙালী জাতি কতদিন আর নিজের বিশেষত্ব এবং সত্তা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। একটি বিষয়ে বাংলা-গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অবহিত হয়েছেন দেখে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে এখন হতে রেশন-এলাকায় যে চাল দেওয়া হবে তাকে যতদূর সম্ভব কম ছেঁটে যতটুকু পারা যায় লাল পাতলা আবরণটুকু রেখে দেওয়া হবে। বাংলা-গবর্ণমেণ্টের

পুষ্টি-সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা কমিটি বহুদিন ধরে এদিকে একই সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের এবং মিল-মালিক-সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে করেও কোন ফল পান নি। বিলম্বে হলেও গবর্ণমেণ্টের এ সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী এবং সমীচীন হয়েছে। তবে মিহি এবং পরিষ্কার চালের ভক্ত বাঙালী সহজে এরূপ চাল খেতে এবং পরিপাক করতে হয়ত সম্মত হবে না; কিন্তু রেশন-এলাকায় 'ভিক্ষার চাল কাড়া আর আকাড়া।' সুতরাং বাধ্য হয়েই ভেজাল এবং অখাদ্য খাদ্য-দ্রব্যের মতই মেনে নিতে হলেও এতে উপকার হবে, এটা খুবই আশা করা যায়।

আমাদের নিজেদের আলস্য ও অবহেলা এবং গবর্ণমেণ্টের দোষত্রুটি দেখানোই এ প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু নয়। আমার উদ্দেশ্য গঠনমূলক সমালোচনা, সেজন্য মুখবন্ধরূপে প্রকৃত ভয়াবহ অবস্থার একটা বিস্তারিত বিবরণ দিতে হ'ল।

সমালোচনার উদ্দেশ্য, পারস্পরিক আলোচনা এবং আশু প্রতিকারের উপায় চিন্তা করা। বাংলাদেশের পরিপুষ্টি-সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা-কমিটি এ বিষয়ে অবহিত এবং সর্ব্বদাই গবর্ণমেণ্টকে সৎপরামর্শদানে উৎসুক এবং সচেষ্ট। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের লাল ফিতে বাঁধানো ফাইলের দৃষ্টি বর্ত্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতের বিরাট কল্পনার দিকে অনেক বেশী এবং 'অত্যাবশ্যক' চিহ্নিত বিষয়গুলিও দীর্ঘসূত্রতার জন্য যথাসময়ে ফলপ্রসূ হতে পারে না। সেইজন্যই বর্ত্তমানের সঙ্কট হতে ত্রাণের জন্য গবর্ণমেণ্টের এবং জনসাধারণের আপাততঃ

কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কতকটা আভাস দেওয়া গেল।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে গবর্ণমেণ্টের **সর্ব্বপ্রথম** কর্ত্তব্য অনতিবিলম্বে দেশের সর্ব্বত্র রেশন-প্রথা প্রবর্ত্তন করা এবং উপযুক্ত মূল্যে দেশের চাষীর নিকট হতে উদ্বৃত্ত শস্য কিনে নিয়ে ও বিদেশ হতে চাল ও গমের আমদানির ব্যবস্থা করে দেশের বর্ত্তমান ঘাটতি পূরণ করা। এ সম্বন্ধে ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী দেশগুলি আমাদের অনেক প্রকারে সাহায্য করতে পারে এবং রাজনৈতিক কারণে তারা যখন সকলেই ভারতের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হতে ইচ্ছুক, তখন আশা করি ভারতকে কয়েক বৎসরের জন্য তারা চাল, গম, মাখন, দুগ্ধজাত অন্যান্য খাদ্য এবং প্রয়োজন হলে অষ্ট্রেলিয়া মাংস পর্য্যন্ত সরবরাহ করতে কোন আপত্তি করবে না। নিজেদের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট কতকটা কাটিয়ে উঠলে চীন, ইন্দোচীন, ভিয়েৎনাম, ব্রহ্ম এবং ইন্দোনেশিয়াও এ বিষয়ে নিজ নিজ সাধ্যমত চেষ্টা করতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ,** গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ট্রলারের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক মাছ হতে বাঙালীর খাদ্যে প্রোটীনের এবং মাছের তেল হতে স্নেহপদার্থ এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র অভাব পরিপূরণ করা। **তৃতীয়তঃ,** বাংলা দেশের সর্ব্বত্র আলু, রাঙা আলু, দাল, কলা, সরিষা এবং চীনাবাদামের চাষ বৃদ্ধি করা। আলুর প্রোটীনের দেহবর্দ্ধক ক্ষমতা প্রায় চালের প্রোটীনেরই সমতুল্য; শুধু তাই নয়, চালের অভাবে

আলুসিদ্ধ কিংবা রাঙা আলুসিদ্ধ মুখরোচক এবং উদরপূরণের জন্য প্রকৃষ্ট খাদ্য। আটা কিংবা ময়দার সঙ্গে আলু কিংবা রাঙা আলুকে সিদ্ধ করে চট্‌কে কিংবা চীনা বাদামের গুঁড়ো মিশিয়ে নিলে, রুটি অত্যন্ত নরম ও সুস্বাদু হয়। সরিষা ও চীনাবাদামের চাষ বর্ত্তমানে বাংলাদেশে এত কম হয় যে, বাঙালীকে সর্ব্বদাই তার জন্য বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং মাদ্রাজের উপর নির্ভর করতে হয়। চেষ্টা করে এ সম্বন্ধে বাংলার স্বাবলম্বী হওয়া উচিত, তা না হলে বাঙালীর খাদ্যে প্রচুর ক্যালরি-সম্পন্ন স্নেহপদার্থের অভাব কিছুতেই দূর হবে না। **চতুর্থতঃ**, গবর্ণমেন্টের উচিত সত্বর, বাংলাদেশের সর্ব্বত্র যে সকল পুরাতন দীঘি, পুকুর, মজা ডোবা প্রভৃতি আছে, তাদের সংস্কার করে তাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের চাষ করা এবং যে সময়ে মাছের পেটে ডিম হয় সে সময়ে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া। ঐ সকল দীঘি অথবা পুকুর-কাটানো মাটিতে খুব সহজে অড়হর প্রভৃতি দালের প্রচুর ফসল হবে, এবং ঐ নূতন মাটিতে কলাগাছ পুতলে তা'তে কলার ফসলও খুব ভাল পাওয়া যাবে। **পঞ্চমতঃ**, বিষ্ণুশর্ম্মার 'কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা, যা ন সূতে ন দুগ্ধদা' এই বাক্য মেনে নিয়ে দুধ দিতে এবং চাষের কার্য্যেও অপারগ দেশে যত অকর্ম্মণ্য গরু আছে, যাতে তাদের পরিবর্ত্তে এদেশীয় আবহাওয়ায় অভ্যস্ত অধিকতর দুগ্ধদা এবং শ্রমসহিষ্ণু গোজাতির সৃষ্টি হয় তা' অগৌণে করা বিধেয়। কারণ এরূপ অকর্ম্মণ্য প্রত্যেকটি গরুর জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের

প্রয়োজন, অথবা ঐ খাদ্য-উৎপাদনের জন্য যে জমির প্রয়োজন—তাতে অন্ততঃ তিনটি লোকের বেঁচে থাকা চলে, সুতরাং ঐ পরিমাণ খাদ্য যাতে অযথা নষ্ট না হয় তা অবশ্যই করতে হবে। অকর্ম্মণ্য গরুর পরিবর্ত্তে মহিষপালনই বরং শ্রেয়ঃ। **ষষ্ঠতঃ**, আইন করে দুধকে নষ্ট করে ছানা করা বন্ধ করা এবং ডাবরূপে নারিকেলের অপচয় বন্ধ করা উচিত। দেশের সর্ব্বত্র দুধেরও রেশনপ্রথা প্রবর্ত্তন এবং যা'তে কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশু, গর্ভিণী, স্তন্যদাত্রী জননী এবং রুগ্ন ও বৃদ্ধ যারা কেবল তাদের জন্যই দুধের বরাদ্দ হয় তাই করতে হবে, তা হলেই দেশের মধ্যে যেটুকু দুধ পাওয়া যায়, তার ন্যায্য ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল পাওয়া যাবে। একইভাবে ডাবের জল খেলে নারিকেল ও ছিবড়ে, এ দুয়েরই অপচয় হয়। পাকা নারিকেলের শাঁস হতে তেল বের করে নিলে বাঙালীর খাদ্যে স্নেহ-পদার্থের অভাব অনেকটা মিটতে পারে, তেলনিংড়ানো শাঁসটুকু বিস্কুট প্রভৃতিতে মেশানো যেতে পারে এবং ঝুনো নারিকেলের ছিবড়ে হতে নানারকম অত্যাবশ্যক বস্তু যেমন দড়ি, পাপোশ প্রভৃতি হতে পারে। অথচ শুধু একপোয়া জল খাবার জন্য প্রত্যহ যে এ রকম লক্ষ লক্ষ ডাব নষ্ট হচ্ছে, একথা বোধ হয় কারো মনেই হয় না। **সপ্তমতঃ**, "সর্ব্বত্র ফসল ফলাও" এর জন্য আরও সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে প্রচার আবশ্যক; আলু, রাঙা আলু, কলা, টমেটো, গাজর, শিম, বরবটি প্রভৃতি যে সকল তরিতরকারির ক্যালরি-মূল্য অধিক অথবা যেগুলি সহজে জন্মায়, সেইগুলির উৎপাদন

বিশেষভাবে বাড়ানো আবশ্যক। যেখানে যেটুকু জমি আছে, এমন কি রান্নাঘরের আনাচে কানাচেও যেটুকু জমি পড়ে থাকে, তাকেও এই কাজে লাগাতে হবে। পেঁপে, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি অতি অল্প মাটিতে অতি সহজে জন্মায় এবং ফলপ্রসূ হয়, সুতরাং এগুলির ফসলও অতি সহজেই বাড়ানো যেতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও অনেক কর্ত্তব্য আছে ; এই উভয় পক্ষেব সহযোগিতা ব্যতীত বর্ত্তমান দারুণ খাদ্য-সমস্যাব সমাধান অসম্ভব। যেটুকু চালের বরাদ্দ আছে, সেটুকু চালেরই ভাত যাতে ফেনশুদ্ধ খাওয়া যায় এবং তার পরিপুষ্টি-শক্তির বিন্দুমাত্র অপচয় না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। বাড়ীতে পুকুর থাকলে তার পঙ্কোদ্ধার করে তাতে মাছ জন্মাবার বন্দোবস্ত করতে হবে এবং যে সময়ে মাছের পেটে ডিম থাকে সে সময়ে মাছ খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। পুকুরের পাড়ে নূতন মাটিতে কলা, অড়হর, টমেটো, শিম, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি খুব ভাল জন্মায়, সুতরাং ওগুলি যতদূর সম্ভব জন্মিয়ে কতকটা খাদ্যের সংস্থান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বাড়ীতে হাঁস ও মুরগী রাখলে অতি সহজেই কিছু ডিমের সংস্থানও হতে পারে। একমাত্র রোগীর জন্য যে কয়টি ডাব আবশ্যক তার চেয়ে বেশী ডাব গাছ থেকে পেড়ে নষ্ট করা উচিত হবে না। বরাদ্দের দৌলতে যেটুকু আটা ও ময়দা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আলু অথবা রাঙা আলুকে

সিদ্ধ করে অথবা চীনা বাদামের গুঁড়ো মিশিয়ে রুটিকে আরও সুস্বাদু ও পুষ্টিকর করে নিতে হবে। যখন মরসুম-শেষে আলুর পরিমাণ কমে আসে সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হতে যে শুখ্‌নো-আলু আনিয়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তাও দোকানে অথবা গুদামে পচতে না দিয়ে যতদূর সম্ভব দেহের পুষ্টির কাজে লাগাতে হবে। গরমজলে তুতিন-ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে তা' আবশ্যক মত জল টেনে নিয়ে প্রায় স্বাভাবিক আলুর মতই হয়ে দাঁড়ায়। তখন ঝোল, ঝাল, ভাজা যে কোন ভাবে ঐ আলু খাওয়া চলে এবং তাতে দেহের পরিপুষ্টির যথেষ্ট সাহায্য হতে পারে।

যদিও বর্ত্তমান পরিস্থিতি-প্রসঙ্গেই বাঙালীর খাদ্য-সমস্যা সমাধানের উপায়রূপে কতকগুলি কার্য্যকরী পরিকল্পনার নির্দ্দেশ দেওয়া গেল, তা'হলেও বাঙালীর চিরন্তন খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্যও যে তাদের বহুলাংশে কাজে লাগানো যেতে পারে, তা' বলাই বাহুল্য। দামোদর-ভ্যালি বা হীরাকুণ্ড-বাঁধ-পরিকল্পনা কিংবা সমবায়পদ্ধতিতে ট্রাক্‌টার চালিয়ে অথবা দেশে প্রস্তুত সারের সাহায্যে অথবা বিদেশ হ'তে সার আনিয়ে জমির উৎপাদিকা-শক্তিবৃদ্ধির পরিকল্পনার সঙ্গে এই সকল ছোট-খাটো পরিকল্পনাগুলিকে কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতেও খাদ্য-সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সুদূর ও বিরাট জাতীয় পরিকল্পনাগুলি যখন বাঙালীর খাদ্য-সংস্থানে ফলপ্রসূ

হবে, তখনও স্বল্পকালস্থায়ী এই পরিকল্পনাগুলির কার্য্য-কারিতা যে বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে এরূপ মনে ক'রবার কোনও কারণ নেই; বরং তারা একে অন্যের পরিপূরকহিসাবে উভয় উভয়ের কার্য্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্ত্তমান যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্ব্বে জাপান যান্ত্রিক শিল্প ও বাণিজ্যে অনেক উচ্চ স্থানের অধিকারী হয়েও ছোটখাটো কুটীর শিল্পের প্রসারের প্রতি যথেষ্ট অবহিত ছিল এবং ফলে জাপানীরা বহু সুসভ্য দেশের অধিবাসীদের চেয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থার অনেক বেশী উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। খাদ্যসমস্যা-সমাধানে এরূপ দ্বৈত প্রচেষ্টা আরো অনেক বেশী ফলপ্রসূ এবং কার্য্যকরী হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কতিপয় সাধারণ খাদ্যোপাদানের নিজস্ব গুণাগুণ

খাদ্যশস্য—চাল, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি প্রধান খাদ্যোপাদানগুলি এই শ্রেণীর খাদ্য। শ্বেতসার-জাতীয় উপাদানের আধিক্যের জন্য এগুলি হতে অতি সহজে শরীর কর্ম্মক্ষমতা পায়। এগুলিতে সাধারণতঃ দেহ পুষ্টিকারক প্রোটীনের পরিমাণ ৭—১৪%। কেবল শস্যজাতীয় খাদ্যের দ্বারা দেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্ভবপর নয়, এজন্যই ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে দাল, মাছ, মাংস, শাকসবজি, তরিতরকারি প্রভৃতি না খেলে চলে না। কলে ছেঁটে এগুলিকে যত বেশী পরিষ্কার করা হয় ততই এদের পুষ্টিকারিতা নষ্ট হতে থাকে, কারণ কুঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইটামিন 'বি,', ক্যাল্‌সিয়াম ও প্রোটীন প্রভৃতি অনেকটা বের হয়ে যায়।

(ক) **চাল**—নিম্নলিখিত কারণে বাঙালীর খাদ্যের প্রধান উপাদান চালের পুষ্টিকারিতা-সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানী পূর্ব্বে বিরূপ মত প্রকাশ ক'রতেন ;

(১) এতে প্রোটীনের পরিমাণ গম অথবা ভুট্টা প্রভৃতি হতে অনেকটা কম ; (২) পরিষ্কার চালে এবং ফেন-গালা ভাতে ভাইটামিন 'বি,' ও ফস্‌ফরাসেরও একান্ত অভাব ; (৩) ক্যাল্‌সিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতব লবণের

অংশও এতে অত্যন্ত কম ; (৪) যারা সর্ব্বদা ভাত খায়, প্রায়শঃ অত্যধিক পরিমাণে উদরপূরণ করে ব'লে তাদের পাকস্থলী ও অন্ত্রগুলির পরিসর বাড়তে থাকে, পেটের মধ্যে গ্যাস্ হয় এবং অন্যান্য খাদ্য হতে পাওয়া প্রোটীন ও ভাইটামিন প্রভৃতির বিশোষণও সেজন্য কম হতে থাকে।

কিন্তু অধুনা চাল-সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা-ফল বের হয়েছে তাতে প্রকাশ যে পূর্ব্বে চালের পুষ্টিকারিতা-সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা' বহুলাংশে ভ্রান্ত, কারণ চালে প্রোটীনের পরিমাণ অন্যান্য কোন কোন শস্য হতে কম হলেও গুণ-হিসাবে চালের প্রোটীনের স্থান অন্যান্য শস্যের প্রোটীনের অনেক উপরে এবং একটু চেষ্টা করে তাকে ঠিক রাখতে পারলে কেবল চালের দ্বারাই শরীরের প্রোটীনের চাহিদা অনেকটা মিট্‌তে পারে। কি ভাবে তা' ঠিক রাখা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফস্‌ফরাস, ভাইটামিন 'বি,' প্রভৃতিও অবিকৃত রাখা যায় পূর্ব্বেই তা' বিশদ্‌ভাবে বলা হয়েছে। এটুকু সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে ঢেঁকিছাঁটা লাল, মোটা ও সিদ্ধ চালই খাদ্য হিসাবে প্রকৃষ্ট। তা'ছাড়া খৈ, মুড়ি, চিড়ে প্রভৃতিও ধান কিংবা চাল হতে প্রস্তুত হয়।

(খ) **গম ও গমজাত উপাদানসমূহ**—আটা, ময়দা, সুজি, পাউরুটি প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য।

এগুলিতে প্রোটীন, ভাইটামিন 'বি,' ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ চাল অপেক্ষা বেশী। আটা ও ময়দার মধ্যে পার্থক্য এই যে, গমের বহিরাবরণের মধ্যে প্রোটীনের যে সেরা অংশ

ধাতব লবণগুলি (বিশেষতঃ দেহবৃদ্ধিকারক ম্যাঙ্গানীজ) ও ভাইটামিনগুলি থাকে, সাদা ময়দার প্রস্তুতি-কালে সেগুলি আর থাকে না ; এবং যা থাকে তা শুধু শ্বেতসারের আধিক্য এবং দেহের পক্ষে অনুপযোগী প্রোটীনসমূহ। এজন্য খাদ্য-হিসাবে লাল আটার রুটি কিংবা ব্রাউন ব্রেড বা লাল্‌চে পাউরুটিই প্রশস্ত। লাল আটার রুটি খেলে কোষ্ঠবদ্ধতাও সারে।

কারো কারো মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সাদা পাউ-রুটি-তৈয়ারির সময়ে তাতে যে ঈষ্ট্ দেওয়া হয় তার জন্য পাউরুটি সাদা হলেও তাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন 'বি-সমষ্টি' থাকে। কিন্তু আজকাল ঈষ্ট্ ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে রুটি প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং যদি বা তারজন্য ঈষ্ট্ ব্যবহৃত হয়, তার পরিমাণ এত অল্প যে তা'তে শরীরের পক্ষে ভাইটামিন 'বি-সমষ্টি'র চাহিদা মিটতে পারে না। টাটকা পাউরুটির চেয়ে বাসী পাউরুটি সহজপাচ্য এবং সেঁকে টোষ্ট করে নিলে তা' হজম করা আরো সহজ হয়।

ভাল করে সেঁকা খাঁটি লাল আটার রুটি সহজ-পাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য। লুচি কিংবা পুরীর মধ্যে শ্বেতসার ফুটন্ত ঘিতে ভাজা হয়ে সুপাচ্য হয় ব'লে, হাতে গড়া রুটি অপেক্ষা তা' অধিকতর সুস্বাদু ও পুষ্টিকর বটে। তবে খাস্তা লুচি, নিমকি, কচুরি, শিঙাড়া প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণে ঘি থাকে ব'লে সেগুলি সাধারণতঃ ফুলকো লুচি বা হাতে গড়া রুটির চেয়ে দুষ্পাচ্য হয়ে থাকে।

কলে ময়দা ভাঙ্গার সময়ে গমের যে দানাদার অংশ

মিহি মসৃণ ময়দায় পরিণত হয় না, তাই ছেঁকে সুজি প্রস্তুত হয়। সুজির মধ্যে দেহের পক্ষে উপযোগী পুষ্টিকর প্রোটীন এবং ভাইটামিন 'বি,'ও অধিক পরিমাণে থাকে। এজন্য সুজির দ্বারা পায়েস, মোহনভোগ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও মুখরোচক নানা খাদ্য প্রস্তুত হয়। সুজির দ্বারা প্রস্তুত হাতে গড়া রুটিও রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

দাল—দালগুলিতে প্রোটীনের পরিমাণ প্রায় মাংসের প্রোটীনের মত হলেও ঠিক ততটা সুপাচ্য নয় ব'লে তেমন পুষ্টিকর নয়, তবু চাল কিংবা রুটির সঙ্গে খেলে তাতে দেহের পক্ষে প্রোটীনের ও ফস্‌ফরাসের প্রয়োজন অনেকটা মিটতে পারে। অঙ্কুরিত কাঁচা অবস্থায় অল্প পরিমাণে খেলে তাতে ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি'র অভাব ঘুচে। তা'ছাড়া কোন কোন দালে, যেমন মসূর, অড়হর প্রভৃতিতে লৌহ ও ক্যাল্‌সিয়ামও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ছোলার দালে অধিক পরিমাণে ক্যারোটিন ও স্নেহজাতীয় উপাদান থাকে। মুগ ও কলাই ছাড়া আর সকল দালই পাকস্থলীতে কমবেশী অম্বল জন্মায় ব'লে, যাদের পরিপাক-শক্তি ক্ষীণ তাদের পক্ষে এই দুটি দালই প্রশস্ত। তা' ছাড়া রান্না দাল ব্যতীত, পাঁপর, কচুরি, ধোকা, বড়া, বড়ী, দালপুরী, জিলিপি, লাড্ডু প্রভৃতি নানা উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্যও দাল হতে প্রস্তুত হয়। দাল ও চাল একসঙ্গে সিদ্ধ করে যে খিচুড়ি প্রস্তুত হয়, তা' মুখরোচক এবং পুষ্টিকর হলেও খুব সহজপাচ্য নয়।

মাছ—সকল প্রকারের মাছই খুব পুষ্টিকর খাদ্য। দেহ-বৃদ্ধির উপযোগী পুষ্টিকর প্রোটীনের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মাছে ভাইটামিন 'সি' ছাড়া সকল প্রকারের ভাইটামিন, মাছের তেলে স্নেহদ্রব্য, ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' এবং সামুদ্রিক মাছে কতকটা আয়োডিন এবং তামাও থাকে। রুই, কাতলা, ভেটকি, ইলিশ, মৃগেল, মহাশোল প্রভৃতি মাছে প্রোটীন, ফস্‌ফরাস, স্নেহোপাদান ও ভাইটামিন 'এ' যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কৈ, মাগুর, শিঙ্গি, ল্যাটা প্রভৃতি জীয়ল মাছে তেল কম থাকে ব'লে এগুলি রোগীর পথ্যের জন্য প্রশস্ত।

চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি মাছের অনুরূপ জলজ প্রাণিদেহে প্রোটীন ছাড়া কতকটা শ্বেতসার এবং সময়ে সময়ে অল্প আয়োডিনও থাকে। তাছাড়া এগুলিতে অল্পাধিক অন্যান্য ধাতব লবণ এবং ভাইটামিনও আছে। কিন্তু প্রায়শঃ দুষ্পাচ্য ব'লে অধিক পরিমাণে এগুলি খেলে সময়ে সময়ে পেটে ব্যথা, বদ্‌হজম এবং পেটের অসুখ হয়; সুতরাং এগুলি সর্ব্বদা অথবা কখনই একসঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়।

দুধ—পুষ্টিকারক যতগুলি খাদ্যোপাদান আছে, তাদের মধ্যে দুধই প্রধান, কারণ এতে দেহক্ষয়-প্রতিষেধক উঁচু দরের প্রোটীন ছাড়া মাখন, ল্যাক্টোজ, ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস এবং ভাইটামিন 'এ', 'ডি' ও 'বি$_2$' প্রচুর পরিমাণে আছে। শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, গর্ভিণী ও প্রসূতির পক্ষে দুধ

একটি অপরিহার্য্য খাদ্য। দুধ হতে দই, ঘোল, মাখন, ঘি, ক্ষীর, পনীর, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি বহু পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্যসম্ভার প্রস্তুত হয়। দই এবং ঘোলে, দুধের উপাদানগুলি ছাড়া ল্যাক্‌টিক এসিড থাকে বলে এগুলি পাকস্থলী ও অন্ত্রের পক্ষে স্নিগ্ধ খাদ্য। মাখন-তোলা দুধে স্নেহ-উপাদান এবং ভাইটামিন ব্যতীত অপর সব উপাদানগুলিই থাকে। দুধ কেটে যে ছানা প্রস্তুত করা হয়, তাতে কেজিনোজেন-নামক প্রোটীন, অল্প মাখন ও ল্যাক্‌টোজ থাকে এবং ছানার জলে এল্‌বুমিন ও গ্লোবিউলিন নামক প্রোটীনদ্বয়, ল্যাক্‌টোজ, ধাতব লবণগুলি এবং অল্প স্নেহ-দ্রব্যও থাকে।

মাখনে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে। মাখন হতে প্রস্তুত ভাল ঘিতে জ্বাল দেওয়ার জন্য ভাইটামিন 'এ'র পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ কমে যায়।

পনীরে মাখন থাকে না, কিন্তু যথেষ্ট প্রোটীন ও ক্যাল্‌সিয়াম থাকে।

ডিম—দুধে যেমন এল্‌বুমিন, গ্লোবিউলিন এবং কেজিনোজেন-নামক তিনটি পুষ্টিকর প্রোটীন আছে, ডিমেও ঠিক তেমনি প্রথম দুইটি এবং তৎসহ ভাইটেলিন নামক আর একটি উঁচুদরের ফস্‌ফরাসযুক্ত প্রোটীন আছে। তা' ছাড়া ডিমের কুসুমে ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ ও স্নেহ-পদার্থ আছে এবং ভাইটামিন 'সি' ছাড়া অপর সকল প্রকারের ভাইটামিন থাকাতে ডিমও দুধেরই মত সহজপাচ্য একটি অতীব পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু অধিক সিদ্ধ ক'রলে অথবা ভাজলে তা দুষ্পাচ্য

হয়ে যায়। হাঁসের এবং মুরগীর ডিমের মধ্যে পুষ্টিকারিতা-হিসাবে কোন পার্থক্যই নেই।

মাংস—মাংস অর্থাৎ সাধারণ মাংস-পেশীতে প্রচুর দেহক্ষয়-প্রতিষেধক উঁচুদরের প্রোটীন, কতকটা চর্ব্বি, ফস্‌ফরাস, ভাইটামিন 'বি$_2$' এবং সামান্য ভাইটামিন 'এ', 'সি' ও 'ই'-ও আছে। সুপাচ্যতা-হিসাবে শ্বেত মাংস অর্থাৎ পাখীর কিংবা খরগোশের মাংসই প্রশস্ত।

যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতি গ্রন্থি খাদ্য-হিসাবে পেশী অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর। এগুলিতে অধিক পরিমাণে চর্ব্বি, ভাইটামিন 'এ', 'ডি', 'বি$_2$', ফলিক এসিড, রক্তকারক উপাদান, লৌহ এবং দেহবৃদ্ধিকারক ম্যাঙ্গানীজও কতক পরিমাণে থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংস অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নয় কারণ তাতে পরিপাকযন্ত্র, যকৃৎ ও বৃক্কের উপর চাপ পড়ে।

তরকারি—এরূপ খাদ্যের মধ্যে শিকড়জাতীয়, ফলজাতীয় শুঁটিজাতীয় প্রভৃতি নানাপ্রকারের তরকারি আছে। শিকড়জাতীয় তরকারি—যথা,—আলু, রাঙা আলু, ওল, শালগম, ওলকপি, বীট প্রভৃতি ; ফলজাতীয়—যেমন লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, কাঁচা পেপে, কাঁচকলা প্রভৃতি ; শুঁটিজাতীয় যথা—কড়াইশুঁটি, শিম, বরবটি, ফরাস প্রভৃতি এবং ফুলজাতীয়—যথা, ফুলকপি, মোচা, বকফুল প্রভৃতি।

শিকড়জাতীয় তরকারির মধ্যে গোল আলুই প্রধান। প্রচুর শ্বেতসারের সঙ্গে এতে যে প্রোটীন-জাতীয় উপাদান

আছে তা' ঠিক চালের প্রোটীনের মতই অন্যান্য উদ্ভিজ্জ প্রোটীন অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর ও উপাদেয়। তা'ছাড়া আলুর খোসার ঠিক নীচেই লৌহ, ক্যাল্‌সিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতব লবণ, ফস্‌ফরাস, প্রচুর ভাইটামিন 'সি' ও কতকটা ভাইটামিন 'বি,'ও থাকে। সুতরাং যতদূর সম্ভব খোসা না ছাড়িয়েই আলুকে সিদ্ধ করে কিংবা ভাজা অথবা পোড়া অবস্থায় খাওয়া উচিত। অম্ল সাইট্রিক এসিডের সঙ্গে উপস্থিত থাকে ব'লে রান্নার পরেও আলুতে কতকটা ভাইটামিন 'সি' অবিকৃত থাকে। আলুতে অধিক পটাসিয়াম থাকাতে, অধিক পরিমাণে আলু খেলে রক্তের ক্লোরাইড অনেকটা পটাসিয়াম যৌগিকে পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং আলুর সঙ্গে সর্ব্বদাই কিছু খাদ্যলবণ খাওয়া উচিত। জমির অবস্থা, ভাল আলুর বীজ ও জমিতে মিশ্রিত সারের গুণ ও পরিমাণ-অনুসারে আলুর পুষ্টিকারিতারও তারতম্য হয়। নূতন আলুতে অধিকতব পরিমাণে ভাইটামিন 'সি' এবং শর্করা থাকে কিন্তু শ্বেতসার কম থাকে; যত পুরাতন হতে থাকে ততই প্রথম দুটি উপাদান কমতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতসারের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ধানের এবং গমের তুলনায় একই পরিমাণ জমিতে প্রায় পাঁচগুণ ওজনের আলুর ফসল হয়, এজন্য ক্যালরি-হিসাবে আলু হতে গম অথবা চালের অনুপাতে প্রায় দেড়গুণ ক্যালরি পাওয়া যায়। সুতরাং সব দিক্ হতেই আলু একটি সুপাচ্য, পুষ্টিকর অথচ সুলভ খাদ্যোপাদান।

রাঙা আলু—রাঙা আলুতে নানা উপাদানের পরিমাণ গোল আলুর অনুরূপ হলেও এতে সেলুলোজ-জাতীয় তন্তুর আধিক্যের জন্য গোল আলু অপেক্ষা এর সুপাচ্যতা কতকটা কম। রাঙা আলুতে শর্করা এবং শ্বেতসারের পরিমাণ গোল আলু অপেক্ষা অধিক হলেও এতে ভাইটামিন 'বি,' গোল আলু অপেক্ষা কম থাকে। রাঙা আলুতে ক্যারোটিন অর্থাৎ ভাইটামিন 'এ'-পূর্ব্ব উপাদান থাকে ব'লে এবং একই পরিমাণ জমি হতে চাল বা গমের তুলনায় তিনগুণ ক্যালরি পাওয়া যায় ব'লেও গোল আলুর মতই রাঙা আলুর দ্বারা চাল এবং গমজাত খাদ্যদ্রব্যের অভাব অনেকটা পরিপূরণ করা যায়।

গাজর—এতে প্রোটীনের পরিমাণ খুবই কম হলেও ধাতব লবণ, ক্যারোটিন এবং ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' যথেষ্ট থাকে, এজন্য গাজর একটি ভাল তরকারি ব'লে গণ্য।

বীট—এতে প্রচুর শর্করা, ধাতব লবণ, ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' এবং কতকটা ক্যারোটিন আছে।

মূলা এবং শালগম—এদের খাদ্যমূল্য বিশেষ কিছুই নেই; কেবল ধাতব লবণগুলি, ভাইটামিন 'বি' ও 'সি' প্রভৃতি উপাদানগুলি অন্যান্য তরকারির তুলনায় অধিক পরিমাণে থাকে। মূলা ও শালগম অধিক পরিমাণে খেলে অন্যান্য খাদ্যের পরিপাক ব্যাহত হয়।

পেঁয়াজ ও রসুন—এগুলিতে কতকটা ভাইটামিন 'বি' ও 'সি', লৌহঘটিত লবণ এবং যথেষ্ট গন্ধক থাকে। এদের

মধ্যে কোন কোন উদ্‌বায়ী তেল থাকাতে একপ্রকারের ঝাঁজ থাকে এবং অল্প পরিমাণে খেলে পাকস্থলী ও অন্ত্ররসের বৃদ্ধির দ্বারা এবং কতকটা জীবাণুদের নষ্ট করেও পরিপাকের প্রভূত সাহায্য হয়। কিন্তু অক্সালিক এসিড থাকাতে পেঁয়াজ ও রসুন অধিক পরিমাণে খেলে পাথুরী রোগ হতে পারে।

মানকচু—এতে যথেষ্ট শ্বেতসার, অল্প প্রোটীন এবং কতকটা লৌহ ও অন্যান্য ধাতব লবণ, ভাইটামিন 'বি,' ও সামান্য ভাইটামিন 'সি'ও থাকাতে এর খাদ্যমূল্য নেহাৎ নগণ্য নয়।

লাউ, কুমড়া, বেগুন, শশা প্রভৃতি ফল-জাতীয় তরকারি—যদিও এগুলির মধ্যে কতকটা ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' এবং ধাতব লবণ আছে, তবুও এদের খাদ্য-মূল্য বিশেষ কিছু নেই বললেও চলে। কেবল শশার মধ্যে অল্প শর্করা ও পরিপাকের সাহায্যকারী একটি এন্‌জাইম আছে।

টমেটো—প্রচুর ক্যারোটিন, ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' থাকাতে এবং অল্প অম্লতাহেতু রন্ধন করার পরেও ভাইটামিন 'সি' বহুলাংশে অবিকৃত থাকে ব'লে টমেটো ফলজাতীয় তরকারিগুলির মধ্যে প্রধান ব'লে গণ্য হয়।

কাঁচা পেঁপে—এর মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রোটীনজাতীয় খাদ্যের পরিপাকের সহায়তার জন্য প্যাপেন নামক একপ্রকার এন্‌জাইম থাকাতে যাদের পরিপাকশক্তি কম তাদের পক্ষে কাঁচা পেঁপে একটি উপকারী তরকারি।

তা'ছাড়া পাকা পেঁপেতে যে সকল উপাদান থাকে, কেবল এক ক্যারোটিন ব্যতীত আর সকল উপাদানই কাঁচা পেঁপেতে আছে।

উচ্ছে, করলা প্রভৃতিতে এক প্রকার তেতো উপাদান থাকাতে এগুলি ক্ষুধাবর্দ্ধক. ও উপকারী তরকারি ব'লে পরিচিত।

ইঁচড়—এটি একটি পুষ্টিকর খাদ্য কারণ, ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' এবং ধাতব লবণগুলিব সঙ্গে এর বিচিতে শতকরা ১৩ ভাগ প্রোটীন আছে, কিন্তু অত্যধিক সেলুলোজ থাকাতে ইঁচড় তেমন সহজপাচ্য নয়।

কাঁচকলা—এতে অল্প সহজপাচ্য শ্বেতসারেব সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে 'ট্যানিন' নামক কষায় উপাদান আছে। এতে যথেষ্ট লৌহঘটিত লবণ আছে, এটি একটি ভ্রমাত্মক ধারণা।

কড়াইশুঁটি, বরবটি, শিম, ফরাস প্রভৃতি খুবই পুষ্টিকর খাদ্যোপাদান, কারণ এগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটীন, ক্যাল সিয়াম ও লৌহঘটিত ধাতব লবণ আছে।

ফুলকপি—এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম, পটাসিয়াম ও ফস্‌ফরাস্‌-ঘটিত ধাতব লবণ, ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' এবং অতি অল্প পরিমাণে ক্যারোটিনও থাকে।

মোচা—অনেকটা কাঁচকলারই অনুরূপ হলেও এতে শ্বেতসারের অংশ খুবই কম।

শাক-সবজি—এ জাতীয় খাদ্যোপাদান দেহক্ষয়-প্রতি-ষেধক ও দেহবৃদ্ধিকারক সামগ্রী ব'লে পরিচিত। এগুলিতে

ক্যারোটিন, ভাইটামিন 'সি' এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম থাকাতে অতি অল্প খরচে এদের সাহায্যে দেহের ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' এবং ক্যাল্‌সিয়ামের প্রয়োজন মিট্‌তে পারে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এটুকু মনে রাখা উচিত যে এরূপ উদ্ভিজ্জ ক্যাল্‌সিয়াম-লবণ কখনই দুধের ক্যাল্‌সিয়ামের মত সহজে রক্তের মধ্যে বিশোষিত হয় না। শাকগুলি সাধারণতঃ কোষ্ঠপরিষ্কারক খাদ্যহিসাবে পরিচিত।

বাঁধাকপি—এতে ফুলকপির মতই যথেষ্ট পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম, পটাসিয়াম ও ফস্‌ফরাস্‌ এবং ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' আছে। অধিকন্তু এতে ক্যারোটিনের পরিমাণ ফুলকপি অপেক্ষা অনেক বেশী।

পালংশাক—এতে ক্যারোটিন, ভাইটামিন 'বি,', 'সি' ও ধাতবলবণগুলি থাকার জন্য এও একটি উপকারী খাদ্যোপাদান। এর লৌহঘটিত লবণ সহজে দেহের কাজে লাগলেও ক্যাল্‌সিয়াম সেরূপ কাজে লাগে না। তা'ছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সালেট লবণ থাকাতে উপকারিতা-সত্ত্বেও এ শাক কখনই বেশী পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়।

লেটুস্‌শাক—এতে ধাতব লবণ, এবং ভাইটামিন (বিশেষতঃ ক্যারোটিন) অধিক পরিমাণে আছে। স্যালাডরূপেই এটি সাধারণতঃ সিদ্ধ ডিম, শশা, বীট ও লেবুর সঙ্গে খাওয়া হয়। এভাবে গৃহীত স্যালাড একটি উপাদেয়, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য।

পুঁইশাক—এতে ক্যারোটিন, ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' ধাতব লবণ (বিশেষতঃ লৌহ) যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এ শাক অতি সুপাচ্য এবং এতে কোষ্ঠপরিষ্কারেরও খুবই সাহায্য হয়।

নটেশাক, মেথিশাক, ধনেশাক, সজনেশাক, পুদিনা প্রভৃতি শাকগুলি সাধারণ বাঙালীর খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শাকের ন্যায় এগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন ও অন্যান্য ভাইটামিন এবং ধাতব লবণ, বিশেষতঃ ক্যাল্‌সিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

উদ্ভিজ্জ তেলগুলিতে স্নেহপদার্থ ছাড়া আর কোন উপাদান নেই বল্লেও চলে, তবু কর্ম্মশক্তিদায়ক উপাদান-হিসাবে সরষের তেলই বাংলাদেশে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অধুনা তার অভাবে 'বনস্পতি'রূপে যা' বাজারে পাওয়া যায় তা' হয় চীনা বাদাম কিংবা তুলোর বীজ হতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন-সাহায্যে শোধনীকৃত এই তেলগুলি ভেজাল সরষের তেলের চেয়ে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। খাঁটি নারিকেল তেল কিংবা 'কোকোজেম' প্রভৃতিও খাওয়া যেতে পারে। আজকাল সরষের তেলের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে সরষের অনুরূপ শিয়ালকাঁটার বীজ হতে উৎপন্ন তেল ভেজাল হচ্ছে যে তার ফলে 'এপিডেমিক ড্রপ্‌সি' নামক ব্যাপক শোথ-রোগ সর্ব্বত্র হচ্ছে। সুতরাং সরষের তেলের **বিশুদ্ধতা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হলে তা কখনই খাওয়া উচিত নয়; তার পরিবর্ত্তে অন্য কোন উদ্ভিজ্জ তেলই খাওয়া উচিত।**

শর্করা—চিনি, গুড়, মিছরি প্রভৃতি এ শ্রেণীর অন্তর্গত। পরিষ্কার অথবা দানাদার চিনিতে কেবল কর্ম্মশক্তিদায়ক উপাদান ছাড়া আর কিছুই নেই। বেশী চিনি খেলে অনেক সময়ে পরিপাকশক্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আখের রসে অথবা গুড়ে শর্করার সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম প্রভৃতি ধাতব লবণ মিশ্রিত থাকে। সুতরাং খাদ্য-হিসাবে গুড় চিনি অপেক্ষা অধিকতর উপকারী।

ফল—তাজা ও টাটকা সকল ফলেই ভাইটামিন 'সি' কম-বেশি থাকে। আম, পেঁপে, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলে ভাইটামিন 'এ'-পূর্ব্বউপাদান ক্যারোটিন থাকে এবং 'বি' অতি অল্প পরিমাণেই থাকে। খেজুর, কিশমিশ প্রভৃতি শুখ্‌নো ফলে ৭০-৮০% ভাগ শর্করা, যথেষ্ট ধাতব লবণ এবং অল্পাধিক ক্যারোটিন এবং ভাইটামিন 'বি,' থাকে। আখরোট, পেস্তা, বাদাম, নারিকেল প্রভৃতি কঠিন আবরণের মাধ্যে শাঁসযুক্ত ফলগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহদ্রব্য ও ভাইটামিন 'বি,' থাকে ব'লে সেগুলি পুষ্টিকর খাদ্যের অন্তর্গত হলেও খুব সহজপাচ্য নয়। মিষ্ট ফলগুলিতে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ নামক অতি সহজে পরিপাচ্য শর্করা থাকাতে তারা খুবই উপাদেয় ও উপকারী খাদ্য ব'লে গণ্য হয়। সকল প্রকারের ফলই অপরাপর খাদ্যের সঙ্গে খেলে কোষ্ঠপরিষ্কারের সাহায্য করে।

আম—এদেশের মরসুমী ফলগুলির মধ্যে আমই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। পাকা আমে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা,

ক্যারোটিন্, ভাইটামিন 'সি' ও কতকটা ধাতব লবণ আছে। কোন কোন আমে যথেষ্ট ছিবড়ে থাকে, তা' অল্প খেলে কোষ্ঠপবিষ্কাব হয়, কিন্তু অধিক পবিমাণে খেলে পেটেব অসুখ হতে পাবে।

কাঁঠাল—এও আব একটি সহজলভ্য মবসুমী ফল, যাতে কতকটা ক্যাবোটিন, ধাতব লবণ এবং অল্প ভাইটামিন 'সি' আছে। অধিক-পাকা অবস্থায় কিংবা কাঁঠাল ভাঙ্গাব অনেকক্ষণ পবে ঝাঁজালো অবস্থায় খেলে পেটে ব্যথা এবং পেটেব অসুখ হয়, কাবণ ঐ অবস্থায় অতি সহজে তা' কিন্বীকৃত (fermented) হয ব'লে দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে। কাঁঠাল বেশি খাওয়া অনিষ্টকব, তাব কাবণ অন্যান্য সকল ফলই দেহে ক্ষাববর্দ্ধক উপাদানেব কাজ কবে; কিন্তু কাঁঠালের ক্রিয়া তদ্বিপবীত। ইহা অম্লবর্দ্ধন করে ব'লে স্বাস্থ্যেব পক্ষে হানিকর।

কলা—মর্ত্তমান প্রভৃতি ভালজাতীয় কলাব মধ্যে সহজ-পাচ্য শর্করা, বেশ কিছু ধাতব লবণ, অল্প পবিমাণে ক্যাবো-টিন, ভাইটামিন 'সি' এবং যৎসামান্য ভাইটামিন 'বি,'ও থাকে। এজন্য সাবাবৎসব সহজেই যে সকল উপাদেয় ও পুষ্টিকর ফল পাওয়া যায়, কলাই তাদেব মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। দুধ-কলা, দই-কলা অথবা ক্ষীর-কলা অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। আর একটি কারণে বাঙালীর খাদ্যে কলার প্রাধান্য হওয়া উচিত, তা' হচ্ছে, গোল আলু, রাঙা আলু প্রভৃতির চেয়েও প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ কলার ফসল

হয়, তার ক্যালরিমূল্য অধিকতর। মেদবহুল দেহের পক্ষে দুধ-কলা একটি অতি উপকারী পথ্য।

পেঁপে—পরিপাকযন্ত্রের পক্ষে পেঁপে একটি উপকারী ফল, কারণ এতে প্যাপেন নামক যে এন্‌জাইম থাকে তার দ্বারা প্রোটীনজাতীয় খাদ্যের পরিপাকের সহায়তা হয়। তা' ছাড়া এতে ক্যারোটিন, ভাইটামিন 'বি,' 'সি', এবং ধাতব লবণও বেশ কিছু থাকে। বছরের সব সময়ে এ ফলটি পাওয়া যায় ব'লে সারা বৎসরই ইহা খাওয়া চলে। কাঁচা পেঁপে তরকারি-হিসাবেও খুব উপকারী।

আনারস—এটি একটি মরসুমী ফল হলেও কোন কোন জাতীয় আনারস বৎসরের সকল সময়েই পাওয়া যায়। প্যাপেনের মত আর একটি এন্‌জাইম থাকাতে আনারসের দ্বারাও প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের কতকটা সাহায্য হয়। তা' ছাড়া এতে প্রচুর খাদ্যলবণের উপস্থিতির জন্য এর সাহায্যে পাকস্থলীতে 'হাইড্রোক্লোরিক এসিড' উৎপন্ন হয় ব'লে তাতে প্রোটীন-পরিপাকের আরও সুবিধা হয় এবং ঐ খাদ্যলবণের সাহায্যে বৃক্কের দ্বারা দেহের অসার পদার্থগুলির রেচনেরও সহায়তা হয়। অধিকন্তু এতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, ভাইটামিন 'সি' ও ধাতব লবণ থাকাতে আনারস একটি উপকারী, উপাদেয় অথচ পুষ্টিকর ফল।

আমলকী—প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন 'সি'র উপস্থিতির জন্য এবং সুলভে ও সহজে পাওয়া যায় ব'লেও এ ফলটি প্রত্যহ খাওয়া উচিত।

সাইট্রিক এসিড-সমন্বিত ফল—কমলা, পাতি, কাগজি, বাতাবী প্রভৃতি লেবুতে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন 'সি', কতকটা ক্যারোটিন ও ধাতব লবণ থাকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে টক্ হলেও সাইট্রিক এসিড-অংশ অতি সহজেই পাকস্থলীতে সোডিয়াম অথবা পটাসিয়ামের সঙ্গে যে যৌগিক লবণ সৃষ্টি করে—তাতে অম্লত্ব নষ্ট হয়ে ক্ষার বর্দ্ধিত হয় এবং মূত্রের সঙ্গে অসার পদার্থগুলির রেচনেরও সাহায্য হয়।

ম্যালিক এসিড-সমন্বিত ফল—আপেল, পীচ, নাশপাতি প্রভৃতি ফল এ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং এদের মধ্যে আপেলই প্রধান। অম্লত্ব-সত্ত্বেও ম্যালিক এসিড সাইট্রিক এসিডের মতই একই ভাবে দেহে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করে। তা' ছাড়া এ এসিডটি পাকস্থলী ও অন্ত্রের পক্ষে স্নিগ্ধকর এবং দাঁতের স্বাস্থ্যও ভাল রাখে। আপেলের দ্বারা কোষ্ঠপরিষ্কারেরও খুব সাহায্য হয়। অধিকন্তু এতে অল্প পরিমাণে ক্যারোটিন, ভাইটামিন 'সি' ও 'বি,' এবং প্রধান ধাতব লবণগুলিও আছে।

মসলা-পাতি—লঙ্কা, ধনে, জীরা, সরষে, কাঁচা লঙ্কা, লবঙ্গ, এলাচি, দারচিনি, হিং, গোলমরিচ, জায়ফল, জয়ত্রী জাফ্রান প্রভৃতি বাঙালীর খাদ্যকে মুখরোচক ও সুবাসিত ক'রবার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। শুখ্‌নো লঙ্কাতে অল্প পরিমাণে ক্যারোটিন ও কাঁচালঙ্কাতে ভাইটামিন 'সি' থাকে। তা' ছাড়া এগুলিতে ক্যাল্‌সিয়ামও কতক পরিমাণে থাকে ব'লে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাল্‌সিয়ামের অভাবও

কতকটা পূরণ করে। কিন্তু তাই ব'লে অধিক পরিমাণে মসলা-পাতি খাওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে অনেক সময়ে সুপাচ্য খাদ্যও দুষ্পাচ্য খাদ্যে পরিণত হয়, পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে জ্বালা করতে থাকে এবং পরিণামে পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে প্রদাহ অথবা ক্ষতরোগ জন্মিতে পারে। অল্প পরিমাণে খেলে পরিপাকের সহায়তা হয় কারণ, খাদ্যের আস্বাদ বৃদ্ধি পায় ব'লে লালা, পাচকাম্লরস প্রভৃতির স্বাভাবিক ক্ষরণ হতে থাকে; সুতরাং তাতে অপকারের পরিবর্ত্তে উপকারই হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

কতকগুলি সাধারণ খাদ্যের প্রস্তুতি-প্রণালী

শুধু কাঁচামাল জোগাড় করতে পারলেই যেমন দৈনন্দিন আবশ্যক বস্তুর চাহিদা মিটে না, তেমনি খাদ্যবস্তু এবং উপযোগী মালমসলা কিনে আনলেই খাদ্য-সমস্যার সব কিছুর সমাধান হয় না। 'খাদ্যের অপচয়' নামক পরিচ্ছেদে কিভাবে খাদ্যের বহু সারাংশ দেহের কোন কাজে না লেগে অজ্ঞতা এবং কখনো কখনো বা অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নষ্ট হয়ে যায়, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বলেছি। সুতরাং আজকালকার দুর্ম্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতার দিনে খাদ্যের যে কোন বিশিষ্ট উপাদানকে নষ্ট হতে দেওয়া অন্যায়, বরং তাকে পাপ ব'লেই মনে করা যেতে পারে। এজন্য যিনি রান্নাবান্না করেন তাঁকে কতকটা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হতে হবে, আর যেখানে রান্না হবে সেস্থানকেও অনেকটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে। হাঁড়ি, কড়াই, বেড়ি ও খুন্তির সমাবেশে কালিঝুলি-মাখা রান্নাঘরকে তুচ্ছ স্থান মনে না করে তাকে আলো ও হাওয়াযুক্ত গৃহের একটি প্রধান কক্ষের পর্য্যায়ভুক্ত করা উচিত, আর সে গবেষণাগারের ডিরেক্টার হবেন নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বর্গতা মাদাম কুরী কিংবা তার কন্যা জুলিয়েট কুরীর সমতুল্যা। প্রতি বাড়ির এই গবেষণাগারে প্রত্যহ চলছে পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণি-

বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রের হাতে-কলমে পরীক্ষা। আগুনের কতটা উত্তাপে জল, তেল কিংবা ঘির কতটা উত্তাপ হবে আর তাতে কোন্ উদ্ভিজ্জ অথবা কোন্ প্রাণিজ খাদ্যোপাদানকে, কোন্ কোন্ বস্তুর রাসায়নিক সংযোগে রসনার তৃপ্তিদায়ক এবং দেহের পুষ্টিকারক খাদ্য-বস্তুতে পরিণত করবে, সেখানে নিয়ত চলছে তার গবেষণা। অঙ্গারের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে হয় ধোঁয়ার সৃষ্টি, আর অক্সিজেন-সংযোগে গ্যাস্, কয়লা বা কাঠের সম্পূর্ণ দহনের ফলে জ্বলে উঠে উত্তাপময় নীল স্বচ্ছ আগুন। জল ফুটতে ফুটতে হয় বাষ্প, আবার হাঁড়ির উপর চাপা দেওয়া ঢাকনিতে সে বাষ্পের পুনরায় হয় জলে রূপান্তর। উত্তাপ-সংযোগে একদিকে যেমন হয় প্রোটীনের তঞ্চন আবার অন্যদিকে তেমনি হয় অদ্রাব্য শ্বেতসারের দ্রবণ। অত্যুত্তাপে যেমন হয় কোন কোন ভাইটামিন কিংবা এন্‌জাইমগুলির পরিমাণ অথবা গুণের হ্রাস, আবার তেমনি মৃদুতাপে পাপেন প্রভৃতি কাঁচা পেঁপের এন্‌জাইম-জাতীয় উপাদানের সংযোগে হয় প্রোটীনগুলির আংশিক পরিপাক। এহেন সকল প্রকারের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সমন্বয় যেখানে, তারি মধ্যে অতীতে একদিন যে গ্যাল্‌ভ্যানিক তড়িৎ-তরঙ্গের আবিষ্কার হয়েছিল তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই। সুতরাং এ গবেষণাগারে পৈতাধারী পুরুষ অথবা কঙ্কন-বলয়ধারিণী গৃহলক্ষ্মী যে কেউই বিরাজ করুন না কেন, ব্যবহারিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি সাধারণ জ্ঞান না থাকলে কিছুতেই

চলবে না ; কেননা বিন্দুমাত্র অসতর্কতার ফলে মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য খাদ্যগুলির শুধু গুণের হানিই নয় অনেক সময়ে সমগ্র খাদ্যটি পর্য্যন্ত অখাদ্যে কিংবা কুখাদ্যে পরিণত হতে পারে। সেজন্য এই পরিচ্ছেদে বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণের অধিকাংশ বজায় রেখে কি করে পুষ্টিকর, উপাদেয় ও উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করা যায় সে সম্বন্ধে দু'চারটি কথা ব'লব। সুগৃহিণী এবং সুপাচিকা (যাঁদের হাতের রান্না খাই নি) আমার এ অনধিকার চর্চ্চার জন্য আশা করি অনুযোগ করবেন না। এতেও যদি কেউ ক্ষুণ্ণ হন তাহলে আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী মহিলা-উকীলটির সঙ্গে বোঝাপড়া করুন ; আমি তাঁর হাতেই অস্ত্র (অর্থাৎ কলমটি) দিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছি।

(১) ভাত

ঢেঁকিছাটা কিংবা কলে অল্প-ছাটা লাল পাতলা আবরণ-যুক্ত সিদ্ধচালই প্রশস্ত। চালে বিশেষতঃ রেশন-লব্ধ ঐ নামধেয় বস্তুটিতে সাধারণতঃ নানাপ্রকারের অখাদ্য (যেমন কাঁকর, ধান, তুষ, মাটির ঢেলা প্রভৃতি) মেশানো থাকে ; সুতরাং রান্নার পূর্ব্বে ওগুলি বেছে ফেলে দিয়ে চালগুলিকে ভালভাবে ঝেড়ে নেওয়া উচিত। তৎপরে পরিষ্কার জলে তা' একবার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

ভাত-রান্নার জন্য মাটির হাঁড়িই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ধাতুর বাসনের মধ্যে কাঁসাই ভাল, না হলে পিতল কিংবা অ্যালুমিনিয়ামও চলতে পারে। চালের পরিমাণের তিনগুণ

জল হাঁড়িতে যখন গরম হয়ে উঠবে তখন চালগুলি জলে ছেড়ে দিয়ে একটি কাঠি বা হাতার দ্বারা নেড়ে হাঁড়ির মুখে এমন ভাবে একটি সরা বা ঢাকনি চেপে দিতে হবে যাতে হাঁড়ির একপাশে সামান্য একটু ফাঁক থাকে। ঐ ফাঁক দিয়ে যখন ফুটন্ত জল উথ্‌লে উঠবে, তখন ঢাকনি সরিয়ে কাঠির দ্বারা আবার চালগুলিকে নেড়ে পুনরায় ঢেকে দেওয়া উচিত। খানিকক্ষণ পরে যখন ভাত ফুটে এলো ব'লে মনে হবে তখন হাতা কিংবা কাঠিতে ছ'একটি ভাত তুলে টিপে দেখতে হবে যে তা' সুসিদ্ধ হয়েছে কিনা। কাঠিব উপর আঙুলের চাপে ভাত যখন অনায়াসে একেবারে গলে যাবে তখন ঢাকনিটি সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে কাঠির দ্বারা ভাতকে নেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে তলায় না ধবে যায় অথচ উদ্বৃত্ত জলটুকু বাষ্পাকারে উড়ে যেতে পারে। চার পাঁচ মিনিট এ অবস্থায় সতর্কভাবে রেখে আগুনের আঁচ হতে নামিয়ে উনুনের পাশে খোলা অবস্থায় রেখে দিলে যে সফেন ভাত প্রস্তুত হয়, পুষ্টিকর খাদ্য-হিসাবে তাই প্রকৃষ্ট।

এরূপ ভাত রান্না করা প্রথমে আয়াসসাধ্য মনে হলেও ছ'চারদিন চেষ্টা করলে চালকে সুসিদ্ধ করতে কতটা জলের দরকার, ভাত ফুটতে থাকলে কতক্ষণ পরে নামাতে হবে, কি ভাবে ভাত সুসিদ্ধ হবে অথচ গলে কাদার মত চট্‌চটে হবে না, এ সব বিষয়ে সঠিক আন্দাজ হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথমে যা শক্ত ব'লে মনে হ'ত, পরে তাই সহজসাধ্য হয়ে যাবে।

যাদের এভাবে ভাত রান্না করার মত ধৈর্য্য অথবা সময়ের অভাব, তাদের পক্ষে 'ইক্‌মিক' কুকার-জাতীয় কোন কুকারে বাষ্পের সাহায্যে ভাত রান্না করে খাওয়াই উচিত। এভাবে যে ভাত রান্না হয় তাতে চালের পুষ্টিকর সকল উপাদানই অক্ষত অবস্থায় থাকে।

(২) দাল

যে কোন দালই রান্না করা হোক না কেন, তাকে প্রথমে ঝেড়ে বেছে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। ভাজা মুগ কিংবা ভাজা কলাইর দালকে ঈষৎ গরম জলে এবং অন্যান্য দালকে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নেওয়া উচিত।

(ক) ছোলার দাল, অড়হর দাল বা মটর দাল

দালের পরিমাণের প্রায় তিনগুণ জল যখন উনুনের উপর হাঁড়িতে বেশ গরম হয়ে উঠবে, তখন দালগুলি ঐ জলে ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ির এক পাশে একটু ফাঁক রেখে ঢাকনি বা সরা চাপা দিতে হবে। ফুটন্ত জল উথলে উঠলে ঢাকনি সরিয়ে জলের উপর যে ফেনা ভেসে উঠেছে, হাতা দিয়ে অল্প অল্প করে তা কেটে ফেলে দিতে হবে। এ ভাবে ফেনা সরে গেলে অল্প হলুদ-বাটা, আদা-কুচি, কিংবা ডুমো ডুমো নারিকেলের টুকরো, কয়েকটি কাঁচালঙ্কা, পরিমিত লবণ ও অল্প চিনি ছেড়ে দিতে হবে। দাল যখন সিদ্ধ হতে হতে গলে যাবার মত হবে, তখন তা' উনুন হতে নামিয়ে নিতে হবে। আর একটি হাঁড়িতে অল্প ঘি জ্বালে চাপিয়ে যখন তা' পেকে

আসবে তখন লঙ্কা, তেজপাতা ও ফোড়ন ছেড়ে দিয়ে তাতে সমস্ত দালটুকু ঢেলে দু এক টুকরো দারুচিনি, আস্ত এলাচি-বিচি ও লবঙ্গ ফেলে দিলেই সুস্বাদু দাল প্রস্তুত হবে।

(খ) ভাজামুগ অথবা ভাজাকলাই দাল

পূর্ব্বের ন্যায় জল গরম হলে দালগুলি জলে ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ির মুখে একদিকে একটু ফাঁক রেখে ঢাকনি চাপা দিতে হবে, যাতে দালের খোসা কি ময়লা অন্যকিছু দালে থাকলে উথলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ফেনার সঙ্গে তা' ঢাকনির গায়ে লেগে যাবে। পরে ঐ ঢাকনি ধুয়ে নিলেই ঐ ময়লা বা খোসা চলে যাবে। দাল কতকটা সিদ্ধ হয়ে এলে তাতে হলুদ-বাটা, আদাকুচি, কয়েকটি কাঁচালঙ্কা, পরিমিত লবণ ও অল্প চিনি দিতে হবে। ঐ সুসিদ্ধ দাল হাঁড়ি হতে নামিয়ে, ঐ হাঁড়িতে উনুনের উপর অল্প ঘি পাকিয়ে নিয়ে ফোড়ন ও তেজপাতা সম্বরা দিয়ে তাতে দাল ঢেলে দিলেই হ'ল।

(গ) কাঁচামুগ কিংবা কাঁচাকলাই অথবা খেসারি দাল

হাঁড়িতে জল বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই দালও জলে ছেড়ে দিতে হবে। খানিকক্ষণ পরে জল ঢাকনির ফাঁকে উথলে উঠলে ঢাকনি নামিয়ে অল্প অল্প করে ফেন সরিয়ে নিতে হবে। তৎপরে কতকটা সিদ্ধ হয়ে এলে তাতে কাঁচালঙ্কা, অল্প হলুদবাটা, আদাকুচি, এবং পরিমিত লবণ দিয়ে খানিকক্ষণ আরও সিদ্ধ করার পর যখন দাল একেবারে গলে

যাবার মত হবে, তখন নামিয়ে অল্প ঘিতে তেজপাতা এবং ফোড়ন দিয়ে সম্বরা দিয়ে নিলেই হবে।

(ঘ) মসূর-দাল

মসূর-দালকে খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে ভাল করে ধুয়ে নেওয়া উচিত। তৎপরে ঠাণ্ডাজলে ঐ দাল ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ির মুখ ঈষৎ ফাঁক রেখে ঢাকনি চাপা দিয়ে জ্বালে চাপিয়ে দিতে হবে। হাঁড়ির জল উথলে উঠলে খানিকক্ষণ অল্প অল্প করে ফেন ফেলে দেওয়া উচিত। এভাবে খানিকটা সিদ্ধ করার পর অল্প হলুদ-বাটা, কাঁচালঙ্কা এবং পরিমিত লবণ দিয়ে যখন দাল সুসিদ্ধ অবস্থায় একেবারে গলে যাবার মত হবে, তখন তা' উনুন হতে নামিয়ে তাতে এমনভাবে কাঠি দিতে হবে যাতে দাল গলে একেবারে জলের সঙ্গে মিশে যায়। ঐ দাল অন্যপাত্রে ঢেলে নিয়ে, অল্প গরম জলে হাঁড়িটি ধুয়ে তাও অন্যপাত্রে রাখা দালের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া উচিত। তৎপরে উনুনের উপর হাঁড়িতে অল্প তেল ঢেলে যখন তা পেকে আসবে তখন তাতে পেঁয়াজ-কুচি, শুখ্‌নো লঙ্কা এবং ফোড়ন দিয়ে সম্বরা দিয়ে নামিয়ে নিলেই মুখরোচক মসূর দাল প্রস্তুত হবে।

(ঙ) তেতো দাল

মটর, কাঁচামুগ অথবা খেসারি দাল উচ্ছে অথবা নিমপাতা-যোগে তেতো দালে পরিণত হয়। দাল সিদ্ধ করার সময়ে তাতে উচ্ছে কিংবা কচি নিমপাতা ছেড়ে দিতে হয়, অথবা

বিকল্পে ফোড়নের সঙ্গে ওগুলি একটু ভেজে নিয়ে তাই দিয়ে দালকে সম্বরা দিলেও চলে।

(চ) টক দাল

সাধারণতঃ যেরূপে দালকে সিদ্ধ করা হয় সেভাবে কাঁচা-মুগ, মসূর কিংবা মটর দালকে সিদ্ধ করতে হবে। তারপর অল্প তেলে সরষে ফোড়ন দিয়ে কাঁচা আম, তেঁতুল, আমড়া অথবা করমচাকে একটু সাঁত্‌লে তাতে দাল ঢেলে দিয়ে সুসিদ্ধ করে নিলেই টক দাল প্রস্তুত হবে। টক দালে ঘি অথবা গরম মসলা দেওয়া চলে না।

(ত) খিচুড়ি

সাধারণতঃ ভাজামুগ কিংবা মসূর দালেই খিচুড়ি ভাল হয়। খিচুড়ির জন্য সমপরিমাণে দাল এবং চাল নিতে হয় এবং উভয়ের সম্মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত জল একটি হাঁড়িতে প্রথম জ্বালের উপর চড়াতে হবে। ধুচুনিতে করে চাল ও দালকে ভাল ক'রে ধুয়ে খানিকক্ষণ রেখে দিলে যখন জল ঝরে যাবে তখন প্রথমে দালগুলি হাঁড়িতে গরম জলে ফেলে দিয়ে প্রায় পনরো মিনিট পরে চালও তাতে ছেড়ে দিয়ে কাঠির দ্বারা ছু'টিকে বেশ করে মিশিয়ে নিতে হবে। যখন ছুইই সিদ্ধ হতে হতে গলে গিয়ে একসঙ্গে মিশে যাবে তখন খুব সাবধানে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে, তা না হলে হাঁড়ির তলায় ধরে যাবার আশঙ্কা থাকে। চাল ও দাল যখন প্রায় ফুটে উঠবে তখনই তাতে হলুদ, লঙ্কা, জিরেমরিচ ও

ধনে-বাটা, আদা ও লবণ পরিমাণ-মত দিতে হবে। খিচুড়িতে অল্প জাফ্রান দিলে রঙ বেশ সুন্দর হয়। চাল ও দাল ভাল করে গলে একত্র মিশে গেলে তা নামিয়ে তাতে আস্ত গরম মসলা এবং ঘি গরম করে ঢেলে দিতে হয়।

গরম গরম খিচুড়ি খেতে খুব ভাল লাগে এবং তা' একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গোটা আলু, শিম, ফুলকপি, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি খিচুড়ি ফুটে উঠার সময় তাতে ছেড়ে দিলে তা' খেতে আরো ভাল লাগে। তবে মনে রাখা উচিত যে দাল-ভাতের চেয়ে খিচুড়ি অপেক্ষাকৃত গুরুপাক; কিন্তু হজম করতে পারলে ইহা একটি অতি পুষ্টিকর খাদ্য।

(৪) ভাতে-সিদ্ধ

শিম, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, বীট, আলু, ফুলকপি, কুমড়ার ডাঁটা প্রভৃতি ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করে ঘি অথবা মাখন সংযোগে খেতে বেশ লাগে। দালও ঐ ভাবে সিদ্ধ করে খাওয়া যায়; কিন্তু দাল যাতে ভাতের সঙ্গে মিশে না যায় সেজন্য এক টুকরা ন্যাকড়ায় দালকে পুঁটুলি বেঁধে ছিড়ে দিতে হয়। ভাত হয়ে গেলে পুঁটুলিটিকে বের করে তা হতে সুসিদ্ধ দাল ঢেলে নিয়ে তাতে লবণ, তেল ও সরষে-বাটা (অল্প পরিমাণে) মেখে নিলে খেতে বেশ ভালই লাগে।

(৫) বেগুন অথবা মোচা-পোড়া

বেগুন কিংবা মোচার গায়ে অল্প তেল মাখিয়ে বোঁটা পর্য্যন্ত মাঝখানে চিরে জ্বলন্ত কয়লার (কাঠের কয়লা হলে

ভাল হয়) উপরে উল্টেপাল্টে পোড়াতে হয়। যখন উপরের খোসাটি পুড়ে ছাই হয়ে ছেড়ে আসার মত হবে, তখন খোসাটিকে ভাল করে ছাড়িয়ে নিয়ে তেল, লবণ ও কাঁচা লঙ্কা সহ মেখে নিলে অতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

একই ভাবে অতি অল্প আঁচে গোটা আলু কিংবা রাঙা আলু পোড়াও অতি মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য।

(৬) পাঁপর-সেঁকা

পাঁপরকে চার ভাগ করে অল্প আঁচের জ্বলন্ত কয়লার উপর একবার এপিঠ এবং আবার ওপিঠ সেঁকে নিয়েই খাওয়া উচিত। ঘিতে অথবা তেলে ভাজা পাঁপর অত্যন্ত গুরুপাক খাদ্য এবং মুখরোচক হলেও তা খাওয়া উচিত নয়।

(৭) আটার রুটি

আটার সঙ্গে পরিমিত জল মিলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ডলতে ডলতে যখন তা'কে বেশ নরম পিণ্ডাকারে ডেলা পাকানো সম্ভবপর হবে তখন ঐ ডেলাটির উপর জল ঢেলে প্রায় ঘণ্টা দুই ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর জল হতে তুলে আবার খানিকক্ষণ ডলে ছোট ছোট অংশে ভাগ ক'রে নেচির মত করতে হবে। তারপরে ঐ নেচিগুলিকে বেলে গোল গোল রুটি প্রস্তুত করে প্রথমে গরম তাওয়ার উপরে এবং তৎপরে জ্বলন্ত কাঠকয়লার উপরে এমন ভাবে সেঁকে নিতে হবে যাতে রুটিগুলি বেশ ফেঁপে ফুলে ওঠে।

অন্যভাবে একটি হাঁড়িতে যখন খানিকটা জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকবে তখন তার উপর একই পরিমাণে আটা ঢেলে দিয়ে এমন করে ক্রমাগত খুন্তির সাহায্যে নাড়তে হবে যাতে কোন অংশ ডেলা না পাকিয়ে সবটাই বেশ চট্‌চটে মসৃণ 'কাই'র আকার ধারণ করে। উনুন হতে ঐ 'কাই' নামিয়ে ঠাণ্ডা করে বেশ চটকে নেচি করে নিতে হবে। তারপর উল্লিখিতভাবে রুটি বেলে সেঁকে নিলেই বেশ নরম ও সুস্বাদু রুটি প্রস্তুত হবে। এই একইভাবে সুজির রুটিও প্রস্তুত করা যেতে পারে।

(৮) আলুর দম

খোসাশুদ্ধ নূতন আলুর দম খেতেও যেমন ভাল হয়, আবার আলুর গুণগুলিও পুরোপুরিই তাতে থাকে। আলুগুলিকে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে প্রথমে একটি হাঁড়িতে ঘিতে সাঁতলানো উচিত। যখন সেগুলি লালচে হয়ে আসবে তখন পরিমাণমত লবণ, অল্প ধনে-বাটা, হলুদবাটা ও শুখ্‌নো লঙ্কার গুঁড়ো, দই ও চিনি সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে ঢেলে দিতে হবে এবং হাঁড়ির মুখে ঢাকনি চাপা দিয়ে যখন আলুগুলি সুসিদ্ধ হয়ে যাবে তখন তাতে আরো কিছু ঘি এবং অল্প গরম মসলা দিয়ে নামিয়ে নিলেই হবে।

(৯) মাছ ভাতে

ইলিশ, কই কিংবা গলদা চিংড়ি ভাতে খেতে বেশ লাগে এবং সেগুলিতে মাছের গুণ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে।

গোটা ইলিশমাছের আঁশ ছাড়িয়ে তাকে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে। কাটার পরে সেগুলি আর ধোওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে ইলিশমাছের নিজস্ব গন্ধ এবং তেল প্রভৃতি পুষ্টিকর অনেকটা খাদ্যোপাদান নষ্ট হয়। একই ভাবে কই মাছের আঁশ ছাড়িয়ে, কানকো কেটে, পেটের নাড়িভুঁড়ি ও পিত্তকে বের করে এবং চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে গোটা মাছকে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর ইলিশমাছের পেট বা পিঠের টুকরো-গুলি, অথবা গোটা কই কিংবা চিংড়িমাছগুলি খাঁটি সরষের তেল, পরিমিত লবণ ও কাঁচালঙ্কা-সহযোগে কলাপাতায় বেঁধে সদ্য-প্রস্তুত গরম ভাতের উপর ওগুলি বসিয়ে তার উপর এমনভাবে আরো গরম ভাত ঢেলে দিতে হবে, যাতে ঐ কলাপাতার পুঁটুলিগুলি চারদিক্ হতে সম্পূর্ণ চাপা থাকে। এভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা রেখে দিয়ে ঐ পুঁটুলিগুলি বের করে তা' হতে মাছ বের করে নিতে হবে।

(১০) মাছের ভর্তা

গোটা মাছের আঁশগুলি ছাড়িয়ে পেট চিরে পেটের নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি অখাদ্য অংশ ফেলে দিয়ে তাকে একটি কড়ায় জলের দ্বারা সিদ্ধ করে নিতে হবে। তৎপরে ঠাণ্ডা হলে কাঁটাকুটি বেছে ফেলে দিয়ে সিদ্ধ মাছের সঙ্গে পরিমিত লবণ, লেবুর রস, কাঁচালঙ্কা, আদা, ছোট এলাচের দানা, ও গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে হবে। অবশেষে

পাকা তেলে ছোট এলাচের দানা ফোড়ন দিয়ে অল্প ভেজে নিলেই মাছের ভর্ত্তা প্রস্তুত হবে।

(১১) মাছ-পোড়া

তৈলহীন মাছই সাধারণতঃ পোড়া খাওয়ার পক্ষে প্রশস্ত। এজন্য সাধারণতঃ শোল, ল্যাটা, পোনামাছ প্রভৃতিরই পোড়া খাওয়া হয়। গোটা মাছটির আঁশ ছাড়িয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি অনাবশ্যক অংশ বের করে নিয়ে মাছের উপরে সামান্য তেল মাখিয়ে গোটা মাছটাকে অল্প কাঠকয়লার আঁচে কিংবা একটি উত্তপ্ত তাওয়ার উপর সাবধানে নেড়ে চেড়ে এমন ভাবে পুড়িয়ে নিতে হবে যাতে তা' সুসিদ্ধ হয় অথচ বেশী পুড়ে খাবার অযোগ্য না হয়। তৎপরে একটি পরিষ্কার শুখ্‌নো ন্যাকড়ায় ঐ মাছটি হতে কয়লা অথবা ছাইগুলি ঝেড়ে নিয়ে তার সঙ্গে পরিমিত লবণ, আদাকুচি, লেবুর রস ও কাঁচালঙ্কা যোগ করে খাঁটি সরষের তেল-সহযোগে মেখে নিতে হবে।

(১২) ইঁচড়ের ডালনা

ইঁচড়কে কাটবার সময়ে হাতে ভাল করে তেল মাখিয়ে নিতে হয়, তা না হলে হাতে আঠা লেগে খুব অসুবিধে হয়। ইঁচড়ের কচি বিচিশুদ্ধ কোয়াগুলিই সব চেয়ে উপাদেয় অংশ। ইঁচড়ের টুক্‌রোগুলি ভাল করে ধুয়ে জলে সিদ্ধ করে নিয়ে ঐ জল ঢেলে আলাদা করে রাখতে হবে। সিদ্ধ ইঁচড়ের সঙ্গে আদার রস, দই, হলুদ-বাটা ও পরিমিত লবণ মাখিয়ে ফুটন্ত

ঘিতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে তা' সাঁতলে নিতে হবে। তারপর ধনে ও জিরেমরিচ বাটা ঐ ইঁচড় সিদ্ধ জলে গুলে সাঁতলানো ইঁচড়ের উপর ঢেলে দিয়ে হাঁড়িতে ঢাকনি চাপা দিয়ে যখন সুসিদ্ধ হয়ে যাবে, তখন ঘি ও গরম মসলা (আস্ত) দিয়ে নেড়ে উনুন হতে নামিয়ে খানিকক্ষণ ঢেকে রাখলেই মুখরোচক ইঁচড়ের ডালনা প্রস্তুত হবে।

(১৩) মাছের ঝোল

মাছকে কেটে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। একই ভাবে আলু, পটোল প্রভৃতি তরকারি যতদূর সম্ভব খোসা রেখে কেটে আগেই ধুয়ে নিতে হবে। মাছে হলুদ-বাটা ও পরিমিত লবণ মাখিয়ে কড়ায় সরষের তেল পাকিয়ে তাতে সাঁতলে আলু, পটোল প্রভৃতি অন্যান্য তরি-তরকারিগুলিকেও সাঁতলে নিতে হবে। তারপরে হাঁড়িতে হলুদ, ধনে, জিরে মরিচ ও মৌরী-বাটা জলে গুলে জ্বাল দিতে দিতে যখন ঐ জল ফুটতে থাকবে, তখন সাঁতলানো মাছ ও তরকারিগুলি তাতে ঢেলে দিয়ে হাঁড়ির মুখে ঢাকনি চাপা দিতে হবে। তরকারি সিদ্ধ হয়ে গেলে অল্প লবণ দিয়ে আরো খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নিলেই হবে।

(১৪) মালাই-কারি

মুরগী, বাগ্‌দা চিংড়ি অথবা পাকা রুই প্রভৃতি মাছের মালাই-কারি করা যায়। পালক ছাড়িয়ে, পেটের নাড়িভুঁড়ি ও পিত্তাশয় প্রভৃতি বের করে নিয়ে মাংসকে স্বাভাবিকভাবে

কেটে নিতে হয়। রুইমাছ প্রভৃতিও একইভাবে কেটে টুক্‌রো করে নিতে হয়। বাগ্‌দা চিংড়ির শক্ত খোসা ছাড়িয়ে মাথাটা বাদ দিতে হয়, কারণ তা' থাকলে মালাই-কারি খেতে বিস্বাদ হয়। একটি হাঁড়িতে উনুনের উপর ঘি জ্বালে চড়িয়ে হলুদ-বাটা, পেঁয়াজবাটা, দারুচিনির গুঁড়ো ও লবঙ্গের গুঁড়ো প্রভৃতি মসলা খুন্তির সাহায্যে নাড়তে নাড়তে যখন লালচে হয়ে আসবে তখন তাতে মাংস ঢেলে দিয়ে সাঁতলাতে হবে। তা' যখন বেশ গাঢ় বাদামী রঙ নেবে তখন তাতে নারিকেলের দুধ * ও পরিমিত লবণ দিয়ে দু'একবার নেড়ে হাঁড়ির মুখে ঢাকনি চাপা দিতে হবে এবং আর জল না দিয়েই অতি মৃদু জ্বালে অনেকক্ষণ ধরে মাংসকে সিদ্ধ করে নেওয়া উচিত। মালাই-কারিতে বেশী ঝোল না থাকাই উচিত, অল্প গা-মাখা গোছের ঝোল থাকবে। যখন মাংস বেশ সুসিদ্ধ হয়ে আসবে, তখন তার উপরে ছোট এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

মাছের কিংবা বাগ্‌দা চিংড়ির মালাই-কারি করতে হলে মাছগুলিকে সিদ্ধ করে নিতে হবে, কারণ না ভেজে সিদ্ধ করে নিলে মাছের আঁষ্টে গন্ধ আর থাকবে না। তার পরের অংশ ঠিক মুরগীর মালাই-কারির মতই, তবে একমাত্র তফাৎ এই যে, মাছের মালাই-কারিতে আদা দিতে হয় না।

---

* মিহি করে নারিকেল কুরিয়ে তাতে সামান্য গরমজল ছিটিয়ে নিংড়ে নিলেই তার দুধ বের হয়।

(১৫) মাছ কিংবা মাংসের স্থপ

পাঁঠা, ভেড়া এবং মুরগী প্রভৃতি পাখীর মাংস অথবা কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মাছ ও মটরশুঁটি, শালগম, আলু, শিম, কাঁচা পেঁপে, গাজর, ফুলকপি, পেঁয়াজ প্রভৃতি তরিতরকারির সহযোগে সুস্বাদু অথচ পুষ্টিকর স্থপ প্রস্তুত করা যায়।

হাড় ও চর্ব্বি-শূন্য মাংসকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে বা মাছের টুক্‌রোকে প্রায় একঘণ্টা কাল সামান্য গরমজলে উন্নুনের পাশে অল্প উত্তাপে বসিয়ে রাখতে হবে। পরে আন্দাজমত লবণ, আস্ত হলুদ, ধনে, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, দারুচিনি, পেঁয়াজ ও তেজপাতাসহ মাছ কিংবা মাংস প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল দেড়সের পরিমিত জলে অল্প আঁচে একটি হাঁড়ির মধ্যে ফুটিয়ে নিতে হবে। তৎকালে যদি কোন চর্ব্বি জলের উপরে ভেসে উঠে, তাহলে তা' হাতা কিংবা চামচের দ্বারা তুলে ফেলে দিয়ে যখন মাছ বা মাংস বেশ সুসিদ্ধ হয়ে আসবে, তখনই তরি-তরকারিগুলিকে আন্দাজমত টুক্‌রো ক'রে অথবা ছোট হলে আস্তই তাতে ফেলে দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। এভাবে জল মরে যখন তিন ভাগের একভাগ মাত্র থাকবে, তখন তা' ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার শক্ত কাপড়ের উপর নিংড়ে যে ক্বাথ বের হবে তা' ছাঁকার পর যে জল থাকবে তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে লেবুর রস, অল্প মাখন বা ঘি-সহযোগে আরও উপাদেয় করে নেওয়া যেতে পারে।

(১৬) পাখীর মাংসের রোষ্ট্

হাঁস, মুরগী কিংবা পায়রার মাংসের রোষ্ট্ করা যায়। পাখীর পালক ছাড়িয়ে তাকে ভাল করে ধুয়ে ছুরি দিয়ে পেট ফাঁক করে অখাদ্য অংশগুলি বের করে নিতে হবে। তারপরে ছোট একখানি নূতন ক্ষুরের ব্লেডের দ্বারা অথবা ধারালো ছুরির দ্বারা পাখীর সারা দেহে আঁচড় কেটে তাতে আদার রস ও অল্প লবণ মাখিয়ে নিতে হবে। কিছু পাঁঠার মাংসের কিমা লবঙ্গ ও ঘি-সহযোগে প্রলেহের মত করে, কিশমিশ ও গরম মসলাসহ তা পাখীর পেটের মধ্যে পূরে সেলাই করে, জলে গোটা পাখীটিকে সিদ্ধ করে একটা লোহার শিকে ফুড়ে নিয়ে আগুনের উপর ঘুরিয়ে নিতে নিতে মাংস-সিদ্ধ জলে পিটুলি, মরিচবাটা, বাদাম-ভাজা, ধনেবাটা, দই, গরম মশলা ও অল্প ঘি মিশিয়ে নিয়ে, ঐ জল বার বার পাখীর গায়ে ছিটিয়ে শুখিয়ে নিতে হবে। যখন এ ভাবে মাংস বেশ সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন তাতে ঘি দিয়ে নামিয়ে নিলেই উপাদেয় ও পুষ্টিকর রোষ্ট্ প্রস্তুত হবে।

(১৭) শাকভাজা

লেটুস্ প্রভৃতি কোন কোন শাককে ভাল করে পটাশ পারমাঙ্গানেট্-জলে ধুয়ে কাঁচা টমেটো, বীট, শসা, পেঁয়াজ ও লেবু সহযোগে 'স্যালাড'রূপেই খাওয়া উচিত।

এদেশীয় পালং, কলমি, নটে, মেথি, পুঁই প্রভৃতি শাকে যে ভাইটামিনের প্রাচুর্য্য আছে, তা বহুক্ষণ ধরে খোলা

অবস্থায় মৃদুতাপেও সিদ্ধ কিংবা ভাজা করলে তাদের গুণ আর বিশেষ কিছুই থাকে না। সেজন্য শাকগুলিকে ভাল করে ধুয়ে কুচি কুচি করে কেটে একটি কড়াইতে ফুটন্ত তেল কিংবা ঘির উপর ছেড়ে দিয়ে খুন্তি দিয়ে অল্প নেড়ে চেড়ে কড়াইর উপর ঢাকনি চাপা দিতে হবে। এভাবে মিনিট পাঁচ রেখে ঢাকনি সরিয়ে আবার একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিলেই শাকের পুষ্টিকারিতা অনেকটা অব্যাহত থাকবে।

(১৮) পুদিনার চাটনি

প্রায় আধপোয়া পুদিনাশাক, দু'টি কাঁচালঙ্কা, অল্প তেঁতুল ও আন্দাজ মত লবণ এবং প্রয়োজনমত চিনি একত্র করে পিষে নিতে হয়। তেঁতুলের বদলে লেবুর রস অথবা কাঁচা আম বেটে দিলেও খেতে খুব ভাল হয়।

(১৯) ছানার ডালনা

ছানাকে ছোট ছোট চৌকো করে কেটে প্রথমেই ঘিতে নরম করে ভেজে নিতে হবে। ছানা বেশী ভাজা হলে শুধু যে গুরুপাক হয় এমন নয়, অধিকন্তু তা ছিবড়ের মত হয়ে যায় এবং খেতেও বিস্বাদ লাগে। কড়াইতে ছানা ভাজার পরে যে ঘিটুকু থাকবে তাতে হলুদ, ধনে, জিরেমরিচ ও আদাবাটা জলে গুলে ঢেলে দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ঐ জল ফুটে উঠলে তাতে ছানা ছেড়ে দিয়ে খুন্তি দিয়ে নেড়ে পরিমিত লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ পরেই তা' নামিয়ে

নিতে হবে। অতঃপর উনুনের উপর হাঁড়িতে কিছু ঘি ঢেলে যখন তা পেকে আসবে তখন তাতে লবঙ্গ, ছোট এলাচ ও দারুচিনি ভেজে ঝোলের সঙ্গে ছানা তার উপর ঢেলে বার কয়েক আস্তে আস্তে নেড়ে আবার ঢেকে দিতে হবে। মাখো মাখো ঝোল থাকতে আরো কিছু ঘি ও গরম মসলা দিয়ে নেড়ে নিয়ে তা' নামিয়ে নিতে হবে ও ঢেকে রাখতে হবে। ছানার ডালনা একটি অতি পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাদ্য। যারা নিরামিষাশী তাদের পক্ষে মাঝে মাঝে এরকম খাদ্য খাওয়া অত্যাবশ্যক।

(২০) ভাত কিংবা পাঁউরুটির পুডিং

অল্প পুরাতন মিহি চাল অল্প জলে একটি ছোট হাঁড়িতে যখন প্রায় সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন তাতে দুধ, অল্প কিশমিশ ও প্রয়োজনমত চিনি দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে নাড়তে বেশ ঘন হয়ে এলে তাকে একটি মুখ-ঢাকা পাত্রে ঢেলে রাখতে হবে। ঐ অবস্থায় তার সঙ্গে একটি ডিমের তরলাংশকে ফেটিয়ে মেশাতে হবে এবং মুখে ঢাকনি চাপিয়ে পাত্রটিকে কাঠ কয়লার ঢিমে আঁচের উপর বসিয়ে ঢাকনির উপর কতকগুলি গন্‌গনে জ্বলন্ত কয়লা তুলে দিতে হবে। পূর্ব্বে পাত্রটির মধ্যে অল্প ঘি বা মাখন গলিয়ে নিলে তলায় সহজে পুড়ে ধরতে পারবে না। এ অবস্থায় প্রায় দশ মিনিটকাল রেখে দিলে পুষ্টিকর ও লোভনীয় পুডিং প্রস্তুত হয়। বেশী

আঁচে যাতে পুডিং-এর তলায় ধরে না যায় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পাঁউরুটির পুডিংও একই উপায়ে তৈয়ারি করা যেতে পারে। কেবল পূর্ব্বে চালকে জলে সিদ্ধ করার বদলে পাঁউরুটির মধ্যেকার নরম শাঁস দিলেই চলবে।

(২১) সুজির পুডিং

সুজিকে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তার সঙ্গে দুধ, অল্প লবণ ও ডিমের কুসুমকে মিশিয়ে নিতে হবে। অপর একটি পাত্রে ডিমের সাদা অংশকে ফেটিয়ে ভাল করে ফেনিয়ে নিয়ে, অল্প আঁচে একটি হাঁড়ি বসিয়ে তাতে তা' ঢেলে দিতে হবে। তারপর তাতে দুধ-মেশানো সুজি ঢেলে দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক আচে রেখে নামিয়ে নিলেই সুজির পুডিং প্রস্তুত হবে।

(২২) রাধাবল্লভী লুচি

এ প্রকার বিশেষ লুচি আকারে অনেক বড় হয় এবং তার মধ্যে মুগ কিংবা কলায়ের দালের পুর থাকে। সম-পরিমাণে আটা ও ময়দার সঙ্গে অল্প মৌরী-বাটা মিশিয়ে সাধারণ লুচির ময়দার ন্যায় ময়ান দিয়ে ঠেসে বড় বড় নেচি করে বেলে ভাল ঘিতে ভেজে নিলেই রাধাবল্লভী লুচি প্রস্তুত হয়। সাধারণ লুচির আস্বাদ হতে এর আস্বাদ স্বতন্ত্র এবং পুষ্টিকারিতাও অনেক বেশী।

বাঙালীর অসংখ্য চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়-সমন্বিত ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের গুণ যতদূর সম্ভব বজায় রেখে সেগুলি প্রস্তুত করবার প্রণালী এ রকম ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই নমুনা-হিসাবে কয়েকটি সাধারণ খাদ্যের প্রস্তুতি-প্রণালী দেওয়া গেল। সহৃদয়া পাঠিকাগণ, যদি এগুলির প্রস্তুতি-সম্বন্ধে আপনাদের কোন সন্দেহ থাকে অথবা অন্যান্য ভাল খাদ্যের ভাইটামিন বা অন্যান্য গুণ ঠিক আছে কিনা জানতে চান, তাহলে লেখককে আপনাদের গৃহে সাদর-নিমন্ত্রণ জানাতে কুণ্ঠিত হবেন না। আপনাদের নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে যদি লেখককে 'কমলাকান্তে'র মতই 'ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ' পেশা করতে হয়, তাতেও লেখক সানন্দচিত্তে সম্মত হবেন। সুতরাং এখানেই 'মধুরেণ' (অর্থাৎ ভবিষ্যতে মধুরের আশায়) 'বাঙালীর খাদ্যের' সমাপ্তি।